মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ১১-১২তম সংখ্যা • রজব-শা'বান-রমাযান - ১৪৩৯ • এপ্রিল-মে-২০১৮

রাজ্য সম্মেলন ও রমাযান সংখ্যা ২০১৮

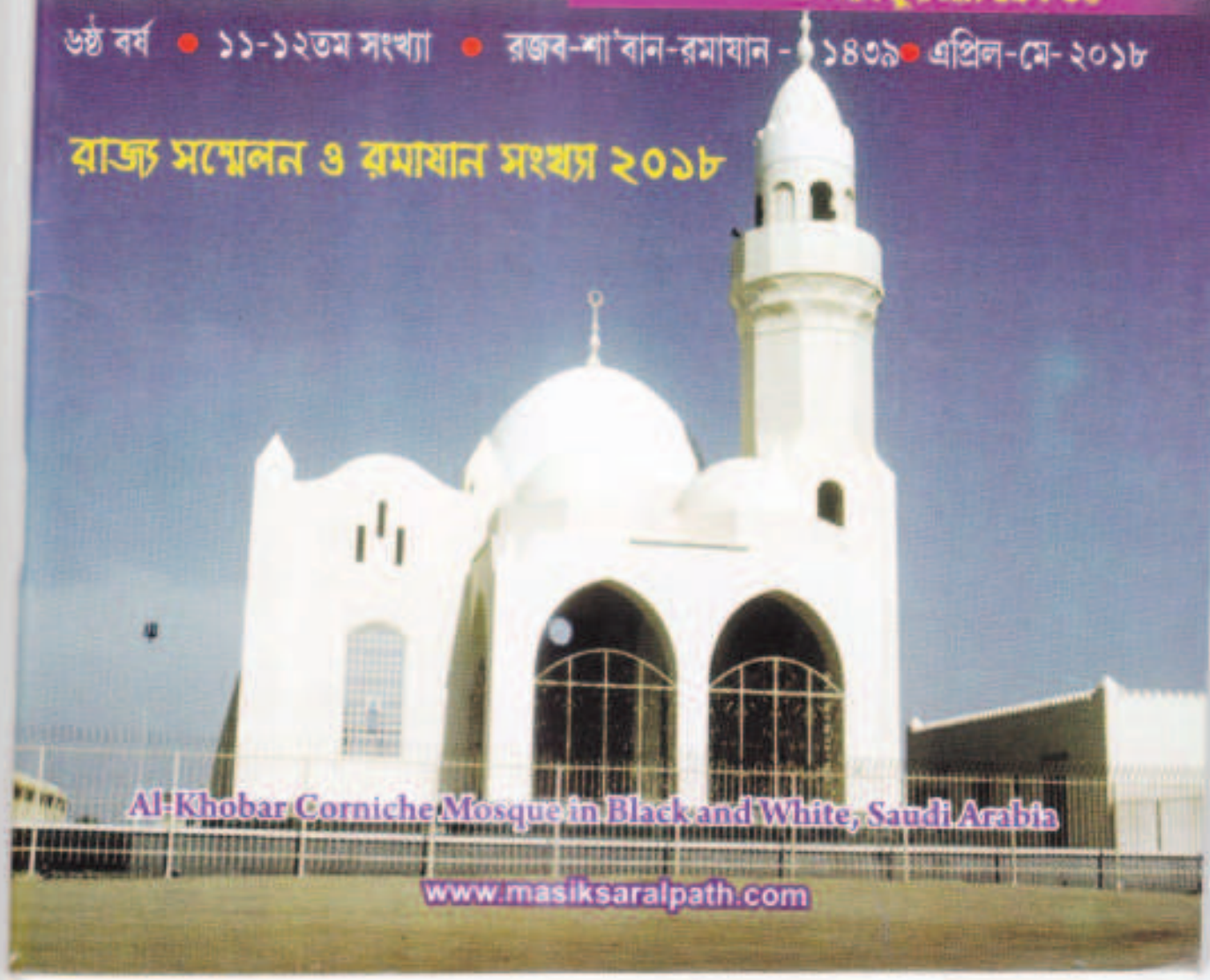

Al-Khobar Corniche Mosque in Black and White, Saudi Arabia

www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ১১শ ও ১২শ সংখ্যা
রজব-রমাযান ঃ ১৪৩৯ হিজরী
চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৪২৪-২৫ বাংলা
এপ্রিল-মে ঃ ২০১৮ ইংরেজি

সম্পাদনা পরিষদ ঃ মোহাঃ তাজাম্মুল হক সালাফী- **সম্পাদক,** আবু ফাইসাল সালমান (খোদাবখ্শ মণ্ডল), আব্দুল্লাহ্ সালাফী, আনওয়ারুল হক ফাইযী, মোহাঃ কুতুবুদ্দিন।

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ রাজ্য সম্মেলন ও রমাযান সংখ্যা-৩৫ টাকা, বাৎসরিক-২০০ /-, বাৎসরিক ডাকযোগে - ২৩০ /-।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

স্বত্ব ঃ সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট।

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

☆☆ *প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।*

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

★ সম্পাদকীয় ৩
★ দারসে কুরআন — আব্দুল্লাহ্ সালাফী ৪
★ দারসে হাদীস — আতাউর রহমান সালাফী ৬
★ রাজ্য সম্মেলন — ১০-৫৫
❒ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস পশ্চিমবাংলা দুইদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ ১০
— সাইদুর রহমান মাদানী
❒ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস পশ্চিমবাংলা রাজ্য সম্মেলন - ২০১৮ ১১
— সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
❒ ইসলামের মানবিক দৃষ্টিকোণ - বিশেষভাবে অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহার ১৮
— মোঃ কুতুবুদ্দীন
❒ ইসলাম কি তরবারীর দ্বারা প্রসারিত হয়েছে? ২৩
— আন্ওয়ারুল হক ফাইযী
❒ সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ২৫
— আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী
❒ দাওআত ও সংগঠন ২৮
— আইনুল হক
❒ ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৩১
— মুখতার হুসাইন (রাহিমী)
❒ তালাক ও তাহলীল ৩৫
— তাজাম্মুল হক সালাফী
❒ ভুল সংশোধনের নববী পদ্ধতি ৩৯
—আব্দুর রাকীব মাদানী
❒ কিয়ামতের আলামত ৪৫
— ইসমাঈল মাদানী
❒ মিডিয়া ও বর্তমান সমাজ ৪৮
— অলিউল্লাহ্ সানাবেলী

❒ মাদক দ্রব্যের শারয়ী বিধান ৫১
— শাইখ জিল্লুর রহমান মাদানী

❒ ইসলামের আলোকে নারী ও পুরুষের সহবস্থানের বিধান ৫৩
— আব্দুল্লাহ্ সালাফী

❒ ফিক্হুল হাদীস — তাজাম্মুল হক সালাফী ৫৬

★ রমাযান — ৫৯-৯৬

❒ কাফ্ফারার বিধান ৫৯
— মুসলেহুদ্দীন বুখারী

❒ রমাযানের সিয়ামের গুরুত্ব ও তার ফযিলত ৬২
— আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম

❒ ঈদুল ফিত্র ৬৬
— মুস্তাফীযুর রহমান

❒ সহীহ্ সুন্নার আলোকে হাজ্জ ও উমরাহ্ আদায়ের পদ্ধতি — আন্ওয়ারুল হক ফাইযী ৬৮

❒ আধুনিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ সাধনে সিয়ামের উপকারীতা ৭১
— মুহাম্মাদ ইসমাঈল

❒ যাকাতুল্ ফিৎর — সরল পথ পরিষদ ৭২

❒ রমাযান মাসে সাহারীর আযান ও ইফতারের জন্য আযানের শারয়ী বিধান ৭৫
— আব্দুল্লাহিল কাফী সালাফী

❒ সিয়াম ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা ৭৮
— মহম্মদ মায্হারুল ইসলাম

❒ তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ কি আলাদা? ৮২
মূল ঃ হাফিয যুবাইর আলী যাঈ
— অনুবাদক ঃ মহঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

❒ সিয়াম ব্রতের কতিপয় বিধান ৮৫
— মহম্মদ শব্দর

★ জানা অজানা ৯০

★ সওয়াল জওয়াব ৯১

★ সংগঠন সংবাদ ৯৫

★ স্বলাতের সময় সারণী ৯৬

কন্যা আপনার শিক্ষা আমাদের সম্পদ দ্বীন ও দুনিয়ার

সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমি

বড়ুয়া পাওয়ার হাউসপাড়া, পোঃ - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৯

পরিচালনায় ঃ বেলডাঙ্গা সরল পথ এডুকেশন্যাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন

Govt. Regd. No. IV-1714 / 15

(হিফ্জ এবং জেনারেল - শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় গড়া একটি আধুনিক আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আস্সালামু আলাইকুম,
সম্মানীয় সুধীবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমি একটি বহুমুখী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভাবে হিফয ও আরাবীসহ জেনারেল শিক্ষা চালু রয়েছে।

অতএব আপনার মেয়েকে দ্বীন ও দুনিয়াবী সুশিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতে অবশ্যই অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো বিভাগে ভর্তি করার প্রস্তুতি নিন ।

এই রকম মহান কর্মযজ্ঞে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা দ্বারা অংশীদার হতে পারেন। সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে —

মোঃ ওলিউল ইসলাম

ইয়াইসুর রহমান সেখ মহঃ মাসউদ বিন আফসার

মূখ্য উপদেষ্টা ঃ আব্দুল্লাহ্ সালাফী

ট্রাস্টের সভাপতি ঃ ইমরান রাশিদ

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা

সেখ মহঃ মাসউদ বিন আফসার (সম্পাদক)
সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমি
বড়ুয়া পাওয়ার হাউসপাড়া, পোঃ - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকীয়

শাস্তিতেই স্বস্তি

মহান আল্লাহ্ হলেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই তিনি মানুষ ও মনুষ্য সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং সর্বোপরি সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিয়েছেন চিরন্তন, অবিকৃত, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় ইসলামী বিধান। যেখানে রাজা-প্রজা, ধনি-দরিদ্র, নর-নারী, সাদা-কালোর মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেবল উপদেশ দিয়ে নয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং অপরাধ দমন করার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ্ বলেন, ''কেসাস বা শাস্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন '' (২/১৭৯)। সুতরাং সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে শাস্তি কার্যকর করা খুবই জরুরী। অপরাধীরা যদি সমুচিত শাস্তি না পায়, তাহলে উত্তোরত্তর অপরাধ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা চরমভাবে বিঘ্নিত হবে এবং সৃষ্টি হবে সর্বত্র অশান্তির বাতাবরণ।

সমস্ত প্রকারের অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যেমন চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে (৫/৩৮), ব্যাভিচার করলে বেত্রাঘাত করতে হবে বা পাথর মেরে হত্যা করতে হবে (২৪/২, ইবনু মাজাহ্ ২৫৪৩), প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত (৫/৪৫)। চুরি করলে হাত কাটা যাবে শুনে ভয়ংকর মনে হলেও এটাই বাস্তব যে, কোনো একজন চোরের হাত কেটে দেওয়া হলে, হাজার হাজার লোকের সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে। হত্যার বিনিময়ে হত্যা শুনে আঁতকে উঠলেও এটাই বাস্তব যে, একজন হত্যাকারীকে প্রকাশ্যে হত্যা করলে হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্র রসূলের ঘোষণা, ''যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম'' (নাসায়ী ঃ৪৮১৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)। এথেকে স্পষ্ট যে বিচার ও অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিচারের ক্ষেত্রে ধনি-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, মুসলিম- অমুসলিম, কালো-সাদা, সম্ভ্রান্ত -অসম্ভ্রান্তের সমস্ত প্রকার ভেদাভেদ সেদিন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজেই মুসলিমের বিপক্ষে খৃষ্টানের পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন। আমিরুল মুমিনীন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই এক খৃষ্টানের বিপক্ষে আদালতে নিজের হারানো বর্মের জন্য বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং প্রমাণের অভাবে হেরেও গিয়েছিলেন (বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ১০/১৩৬ হাদীস নং ২০২৫২)। পরে অবশ্য আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় খৃষ্টান লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেন। এখনো সৌদি আরবে ইসলামী নিয়ম মেনে শাস্তির ব্যবস্থা আছে বলে ব্যাভিচারকারী ব্যাভিচার করে বুক ফুলিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে না, হত্যাকারী হত্যা করে রাজপথে প্রকাশ্য বিচরণ করতে পারে না, নিহতের পরিবারকে সুবিচার পাবার জন্য আদালতের চত্বরে চত্বরে বছরের পর বছর জুতো ক্ষয় করতে হয় না। অহরহ চুরির ঘটনা ঘটে না। হত্যা রাহাজানির ঘটনাও তেমন ঘটে না বললেই চলে। কেননা সবাই জানে ধরা পড়লেই শাস্তি কার্যকর হবে। ব্যাভিচারের অপরাধে বাদশাহর ভাইঝির হত্যা এবং হত্যার অপরাধে সৌদি যুবরাজের হত্যা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আজও সেখানে এ ধরণের অপরাধের জন্য পদমর্যাদার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অপরাধীকে আসামী হিসাবে ট্রিট করা হয় এবং শাস্তি কার্যকর করা হয়। এজন্যই তো ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী হয়েও শিব সেনার নেতা রাজ ঠাকরে বলেছেন ঃ 'ভারতে ইসলামী কানুন লাগিয়ে দিন, ব্যাভিচার বন্ধ হয়ে যাবে।'

ভারতে সংবিধানে চুরি, হত্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদি অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেটাই যদি স্বচ্ছভাবে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধনি-দরিদ্র, নেতা-অনুসারী, সদল-অন্যদলের সমর্থক ও হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান ও শিখের মধ্যে পার্থক্য না করা হয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়, তাহলে অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে, সমুচিত শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি দেশে অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং অপরাধীদের দৌরাত্ম বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে একদল অপরাধীর শাস্তির দাবিতে মিছিল করে আর আরেক দল তার অপরাধ ঢাকতে মিছিল করে। সাম্প্রতিককালে মালদহের যুবক আরফাজুলের হত্যাকারীর সমর্থনে এবং আসিফার ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীদের সমর্থনেও একদল মানুষকে মিছিল করতে দেখা গেছে। তাও আবার ভারতে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে। ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসে এ ঘটনা বিরলতম। ভারতীয় ইতিহাসে এ এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সারা বিশ্বে ভারতের মুখ পুড়েছে। বিদেশের মাটিতে গিয়েও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখতে হচ্ছে এবং গো ব্যাক ধ্বনি শুনতে হচ্ছে — এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে? দেশে যদি সংবিধান মেনে বিচারকার্য পরিচালিত হত এবং সঠিকভাবে রায় কার্যকর করা যেত, তাহলে নির্ভয়ার আত্মা ও তার পরিবার সঠিক বিচার এতদিন পেয়ে যেত। উন্নাও, কাঠুয়া ও সুরাতের মত ভয়ংকর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাও ঘটত না। আসিফার বিচারের জন্য কোটি কোটি মানুষকে পথে নামতে হত না। জমঈয়তে আহ্লে হাদীসের পক্ষ হতে আমাদের একটাই দাবি — অপরাধির ধর্ম-বর্ণ ও জাত-পাত না দেখে কেবল অপরাধের সমুচিত শাস্তি কার্যকর করা হোক।

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

ইসলামী ঐক্যের মানদণ্ড

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْـرِ مِـنْـكُـمْ فَـاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَـرُدُّوْهُ اِلَـى اللّٰهِ وَ الـرَّسُـوْلِ اِنْ كُـنْتُـمْ تُـؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

হে ঈমান আনয়ণকারী ব্যক্তিগণ অনুগত হও আল্লাহ্‌র এবং অনুগত হও (তাঁর) রসূলের, আর তোমাদের মাঝে (জীবিত) নেতাদের। কোনো বিষয়ে যদি তোমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট সোপর্দ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ (বিচারের) দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম (সূরাতুল নিসা, ৫৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَـلَيْكَ السَّـمْعَ وَ الطَّاعَةَ فِىْ عُسْرِكَ وَ يُسْرِكَ وَ مَنْشَطِكَ وَ مَكْرَهِكَ وَ أَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

তোমার জন্য আনুগত্য অত্যাবশ্যক ও নেতার নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক দুঃখে সুখে, তোমার পছন্দের নির্দেশ অথবা অপছন্দের হোক। কিংবা তোমাকে উপেক্ষার অবস্থাতেই হোক (সহীহ্ মুসলিম ১৮৩৬)।

আয়াতে আনুগত্য করার নির্দেশে সর্বস্তরের জীবিত নেতাগণকে যুক্ত করা হয়েছে, তা শর্ত সাপেক্ষে। অর্থাৎ তাঁরা যদি শরীআত বিরোধী কোনো নির্দেশ দেন যা স্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী তাহলে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না। সরাসরি কোনো দলীলের পরিপন্থী না হলে তাঁদের কথা মেনে চলতে হবে। কেননা যদি সৎ নেতা হন, তাহলে তাঁর দৃষ্টিকোণ অনুগামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নততর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য পরামর্শ শেষে যে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হচ্ছেন নেতা। এমতাবস্থায় অমান্যকারীদের ইসলাম প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন কিতাব ও সুন্নাহ্‌র নিঃশর্ত আনুগত্য বাধ্যতামূলক, অনুরূপ কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দলীলের প্রেক্ষিতে নেতার নির্দেশ বাধ্যতামূলক। সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত নেতার বিপক্ষে নেতৃত্ব কামনাকারীকে ইসলামে মুরতাদ বা দ্বীন বিমুখ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এমন ঘটনা ঘটলে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং ইসলামী নেতৃত্ব যতক্ষণ দলীল ভিত্তিক কথা বলবেন ততক্ষণ সেটাই একমাত্র ঐক্যের ভিত্তি। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

اَلسَّـمْعُ وَ الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَ كَرِهَ مَا لَـمْ يُـؤْمَـرْ بِـمَعْصِيَةٍ فَاِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَ لَا طَاعَةَ.

একজন মুসলিমের জন্য (নেতার নির্দেশ) শোনা ও তা পালন করা অপরিহার্য তা তার পছন্দের হোক অথবা অপছন্দের, যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে। যদি তাকে পাপের আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে তার কথা শোনা ও মানা চলবে না (হাদীস সহীহ্, তিরমিযী ১৭০৭)।

আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'' বলা ব্যক্তির সাথে কিতাল করা যাবে না। যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলল সে আমাদের হতে স্বীয় সম্পদ ও প্রাণ সুরক্ষিত করে নিল। শুধুমাত্র যাকাত প্রদান করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির সঙ্গে কীভাবে কিতাল - যুদ্ধ করতে পারেন যেখানে তারা কালিমাতে বিশ্বাসী। তাদের আভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগ থাকলে আল্লাহ্ তার হিসাব নিবেন। আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যারা স্বলাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হল মালের পরিশোধক। শপথ আল্লাহ্‌র তারা উটের বাচ্চাটিও যদি যাকাত হিসাবে প্রদান করতে বাধা প্রদান করে, যা তারা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে প্রদান করত, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন,

আমার মনে হয়েছে, আবূ বাকরের বক্ষকে আল্লাহ্ এ বিষয়ে উন্মুক্ত করেছেন ও তাঁকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন (ভাবার্থ, সহীহ মুসলিম, ৩২)।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নেতা ও তাঁর অনুগামীদের ভাবনার মধ্যে পার্থক্য থাকে। সুতরাং বিতর্কিত মাস্‌আলা সমূহেও ঐক্য টিকিয়ে রাখতে নেতার আনুগত্য করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। আর তাতেই কল্যাণ রয়েছে। জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, কোনো বিষয় আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র বিপক্ষে জনসাধারণের তথা অনুগামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হক হওয়ার জন্য দলীল নয়। মহান আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে জামাআত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি একাই হকের পক্ষে নিরন্তর আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম করে চলেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয় ইব্রাহীম আল্লাহ্‌মুখী ও তাঁর অনুগামী দল ছিলেন এবং তিনি মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'' (সূরাতুন্ নাহ্‌ল ১২০)। বিখ্যাত আলিম শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বলেন —

حيث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق و اتباعه.

অর্থাৎ জামাআতের আনুগত্য করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে যে আদেশ আছে তার ভাবার্থ হল 'হক' কে আঁকড়ে ধরা ও মেনে চলা। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র কথা থেকে এটা বুঝেছেন। তিনি বলেন —

ان جمهور الناس فارقوا الجماعة و ان الجماعة ما وافق الحق و ان كنت وحدك.

নিশ্চয় লোকেরা (আল্লাহ্‌র মনোনিত) জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। নিশ্চয় সেটিই আল্লাহ্‌র নিকটে জামাআত যা হক বা দলীলের অনুকূলে হবে, তাতে তুমি যদি একাই হও।

নুআইম বিন হাম্মাদ বলেন —

اذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، و ان كنت وحدك ، فانك انت الجماعة حينئذٍ.

যখন জামাআত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে, তখন তোমার কর্তব্য হল বিচ্ছিন্নতার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া, তাতে তুমি একাই হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এমন মুহূর্তে তুমি একাই জামাআত।

(طريق الهداية مبادئ و مقد مای علم التوحيد عند اهل السنه و الجماعة (লেখক মুহাম্মাদ য়ুসরা পৃষ্ঠা ৭০)

বুঝা গেল যে, ঐক্যের জন্য জামাআতী জীবনে একমাত্র দলীলের ও দলীল ভিত্তিক পরিচালক নেতার আনুগত্য করাটা অত্যন্ত জরুরী। পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দলীল বহির্ভূত জীবন যাপনে অভ্যস্ত নেতার আনুগত্য আমাদের অনৈক্যের মাঝে বড় অন্তরায়। বর্তমানে দাবীর ভিত্তিতে হকপন্থি দল হিসাবে বিবেচ্য নয়। কিতাব ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র নিঃশর্ত ও নির্ভেজাল আনুগত্য আমাদেরকে আবার ঐক্যের সূতোতে গ্রোথিত করতে পারে। সেটাই হচ্ছে 'হাবলুল্লাহ্' যার ভিত্তিতে ঐক্যের নির্দেশ মহান আল্লাহ্ প্রদান করেছেন (সূরাতু আলে ইমরান ১০৩)।

আম্মাপারা

(আয়াত , উচ্চারণ ও অর্থ)

পরিবেশনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ সালাফী

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **মিল্লাত বুক হাউস**, বড়ুয়া মার্কেট কমপ্লেক্স, বেলডাঙ্গা, মোবাইল ঃ 8926616165

২। **চিলড্রেন বুক হাউস** , এম.পি. রোড, বেলডাঙ্গা, মোবাইল ঃ 9734875306

৩। **আল্ হিলাল বুক হাউস** সাগরদীঘি, মোবাইল ঃ 7479387283

৪। **সামসী বুক সেন্টার**, সামসী, মালদা মোবাইল ঃ 9734971714

৫। **পপুলার বুক ষ্টল**, হরিহরপাড়া রোড, ভাকুড়ি, বহরমপুর, মো ঃ 9932778700

হাদীসের পাঠ

তারাবীহ্ কী ও কেন?

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি রমাযান মাসে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হয়, তার পূর্বের (সাগীরা) গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'' *(বুখারী ঃ অধ্যায় - রমাযানের নফল কিয়াম ঈমানের অংশ, হাদীস নং ৩৭, অধ্যায় - রমাযানে কিয়াম করা ব্যক্তির ফাযীলাত, হাদীস নং ২০০৮, ২০০৯; মুসলিম ঃ অধ্যায় - রমাযানের কিয়াম তারাবীহ্র প্রতি অনুপ্রেরণা, হাদীস নং ১৭৩)*।

হিজরী সালের নবম মাস রমাযান। এ মাস একজন মুমিনের জন্য অমূল্য উপহার। একজন মুমিন একে স্বাগতম জানিয়ে সাদরে বরণ করে। এ মাসে রয়েছে একগুচ্ছ ইবাদাত, যার মাধ্যমে একজন মুমিন নিজেকে পাপমুক্ত করার মোক্ষম সুযোগ অর্জন করে। বিনিময়ে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথ হয় মসৃণ। এ রমাযান মাসের ইবাদাত সমূহের অন্যতম ইবাদাত তারাবীহ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে বক্ষমান হাদীসে। বাহ্যতঃ সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য, অথচ অর্থবহ হওয়ার দরুণ বহু কথা রয়েছে এতে অন্তর্নিহিত।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ছিলেন সুদক্ষ দ্বীন প্রচারক। দ্বীন প্রসারের ব্যাপকতা দেখে আপনজন হয়ে যায় ঘোরতর শত্রু। ফলে জন্মভূমি মক্কা তাঁর জন্য হয়ে উঠে সম্পূর্ণরূপে বাসের অনুপযোগী। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ পেলেন জন্মভূমি পরিত্যাগের। নাবী হওয়ার ১৪তম বছর। হিজরী সালের দ্বিতীয় মাস সফরের ২৭ তারিখ। দ্বীন রক্ষার্থে পাড়ি দিলেন মদীনা অভিমুখে। ইসলামী ইতিহাসে এ ঘটনা হিজরত নামে পরিচিত। এ হিজরতের পরবর্তী বছরের ৮ম মাস শাবান মাসে রমাযানের সওম ফরয হয়। অর্থাৎ নাবী হওয়ার ১৫ বছর পর এবং হিজরতের ১৮ মাস পর বদর যুদ্ধের পূর্বে। প্রকাশ থাকে যে, স্বলাতের বিধান ফরয হয় হিজরতের পূর্বেই *(আর্ রাহীকুল মাখতূম, মিরআতুল মাফাতীহ্)*।

রমাযান মাসে এ সওমই একমাত্র ফরয। সওম ছাড়া অন্য সকল ইবাদাত নফল। এ মাসের নফল ইবাদাত সমূহের অন্যতম হল তারাবীহ।

তারাবীহ্ স্বলাত কার জন্য ঃ হাদীসের শুরুর শব্দ **مَنْ قَامَ** (যে ব্যক্তি তারাবীহ্র জন্য কিয়াম করবে) দেখে মনে হচ্ছে, যে কেউ এ ব্রত পালন করতে পারে, কিন্তু মূলতঃ যে কেউ তা পালন করলে প্রতিদান পাওয়া যাবে না। প্রতিফল ও সাওয়াব এই শর্তে পাওয়া যাবে যে, ইসলামের অনুসারী হতে হবে। ইসলাম অবশ্যই সকলের জন্য। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ অতঃপর আমল সম্পাদন করলে তবেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। এখানে **مَنْ** (যে) শুধুমাত্র ইসলামের অনুসারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ ইবাদাত মূল ইবাদাত সওমকে বাহন করে এসেছে। আর সওম মুমিনদের জন্য (২/১৮৩)। যেহেতু মূল ইবাদাত সওম মুমিনদের জন্য, ফলে তাকে বাহন করে আগত তারাবীহ্ও মুমিনদের জন্য। কাজেই নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীসের **مَنْ** (যে, যারা) এর অর্থ শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য প্রযোজ্য। ঈমানদার কারা সে বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধানানুযায়ী জীবন যাপন করে তারা ঈমানদার *(কুরআন মাজীদ ৮/১-৪, ৪/৬৫ - এর সারমর্ম)*।

কিয়াম কী ঃ হাদীসে কিয়ামের জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল **قَامَ رَمَضَانَ** (অর্থাৎ রমাযান মাসে দণ্ডায়মান হল, কিয়াম করল)। এর অর্থ আল্লামা উবাইদুল্লাহ্ রহমানী মুবারাকপুরী লিখেন, ''রমাযান মাসের রাত্রিগুলি অথবা অধিকাংশ রাত্রি অথবা প্রতি রাত্রের কিছু অংশ তারাবীর স্বলাত, কুরআন তেলাঅত, যিকর, তাওয়াফ ও এ ধরণের অন্য ইবাদাতের মাধ্যমে যাপন'' *(মিরআতুল মাফাতীহ্)*। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানী ও মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নওয়াবী এ কিয়ামের অর্থ স্বলাতুত্ তারাবীহ্ নিয়েছেন। তাঁরা উভয়েই মত প্রকাশ করেছেন যে, তারাবীহ্তেই কিয়াম পাওয়া যায় *(ফাত্হুল বারী ও শারহু মুসলিম)*। আবার ইমাম মুসলিম হাদীসটির অধ্যায়ের নামই দিয়েছেন 'রমাযানের কিয়াম তারাবীহ্র প্রতি অনুপ্রেরণা'। এঁরা ছাড়াও অন্য মুহাদ্দীসগণ এ কিয়ামের অর্থ তারাবীহ্ই নিয়েছেন।

এ কিয়াম কোন্ মাসে ঃ উপরের তারাবীহ্ নামক কিয়াম কোন্ মাসে পালিত হবে সে উত্তরও এ হাদীসে নিহিত রয়েছে, আর তা হল رَمَضَانَ (রমাযান) মাস। এটি চান্দ্র বর্ষের নবম মাস। রমাযান শব্দের মূল ধাতু رَمَضَ এর অর্থ হল দুটি পাথরের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে ঠোকা, কুটা, হাল্কা-পাতলা করা এবং জ্বালানো, পোড়ানো *(মিসবাহুল লুগাত)*।

অর্থাৎ এ এমনই এক মাস যেখানে একজন মুমিন একদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নামক পাথর, অপরদিকে খাদ্য-পানীয়, বৈধ স্ত্রীর ব্যবহার ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সওম নামী পাথর, দুইয়ের মাঝে অবস্থান করে অর্জন করে তাক্ওয়া। হয় পাপমুক্ত। তবুও হয়না আত্মাতৃপ্তি। সন্ধানী থাকে আরো স্বচ্ছ হওয়ার জন্য। সওম পালনে দুর্বল হয়েও ব্যাকুল থাকে আরো কিছুর মাধ্যমে নিজেকে আরো পাপমুক্ত, আরো ঝকমকে করার প্রতি। তাই তো সে লাইলাতুল কদরের ইবাদাত, ইতিকাফ, কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তারাবীহ্ একদিকে, অপরদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, দুইয়ের মাঝে নিজেকে রেখে তীক্ষ্ণ করে ঈমান, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে শয়তানী প্রবৃত্তি। এ অনুশীলন দু-চার দিনে বন্ধ না করে ধারাবাহিক চালিয়ে যায় পুরো একটি মাস।

এ কিয়াম কোন্ অবস্থায় পালন করতে হবে ঃ একজন তারাবীহ্ পালনকারী কোন্ অবস্থায় থাকবে সে প্রসঙ্গেও এ হাদীসে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের শব্দ হল اِيْمَانًا অর্থাৎ সে ঈমানের অবস্থায় থাকবে। তার একাজ ঈমান তাড়িত কাজ হবে। তারাবীহ পালনকারী ব্যক্তি যদি ঈমান বহির্ভূত, কুফ্র অথবা নিফাক অবস্থায় থাকে তবে তারাবীহ্ পালন সার্থক হবে না। ঈমানের অবস্থায় থাকার অর্থ হল ঐ ব্যক্তি মুমিন হবে। কেননা মুমিন ব্যক্তিই ঈমানের অবস্থায় থাকে।

একজন মানুষ যদি বাসনা রাখে যে, রমাযান মাসের ফযীলাত গ্রহণের আশায় ভাল মানুষ সেজেছি, রমাযান বিদায়ের সাথে সাথে আমিও পূর্ব চরিত্রে ফিরে যাব। তবে এমন ব্যক্তি মুনাফিক। মুনাফিক হল সেই ব্যক্তি যার বাহ্যিক আমল হয় ঈমানের, কিন্তু অন্তরে লুকিয়ে থাকে তার বিপরীত। এ ব্যক্তি শুধু রমাযান মাসে সিয়াম ও তারাবীহ্ পালনের মাধ্যমে উপরে উপরে সাজতে চায় পাক্কা ঈমানদার, কিন্তু রমাযান বিদায়ের সাথে সাথে বেঈমান হয়ে যাওয়ার ভাবনা অন্তরে রাখে লুকিয়ে। অপরদিকে এগারো মাস ইসলামী বিধান বিসর্জন দিয়ে, লাগামহীন ভাবে চলে, অনৈসলামী রীতিনীতি নিঃসঙ্কোচে পালন করে শুধুমাত্র রমাযান মাসে স্বলাত, সওম, তারাবীহ্ ইত্যাদি পালন করলে ঈমানদার বলার মতো কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নেই। এ রকম ইবাদাতকারী ও তাদের সমর্থকদের নিকট যুক্তি নয় কোনো প্রমাণ জানা থাকলে আমাদের জানানোর জন্য একান্ত অনুরোধ জানাই। পরবর্তীতে এ সরল পথেই আমরা সে প্রমাণ ও তার বিশ্লেষণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো ইন্শাআল্লাহ।

তারাবীহ্ স্বলাত কেন পড়তে হবে ঃ একজন মুসলিম তারাবীহ্ কেন পালন করবে সে বিষয়েও এ হাদীসে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে اِيْمَانًا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ তারাবীহ্ এ জন্যই পালন করতে হবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আছে এবং এও বিশ্বাস আছে যে, এ বিধান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এবং এ তারাবীহ্ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত — এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাবীহ্ সম্পাদিত হলে ইসলামের বাকী বিধানও তার দ্বারা আঞ্জাম পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় শব্দ اِحْتِسَابًا দ্বারা বলা হয়েছে — সওয়াবের আশায়, পরকালে এর বিনিময় পাওয়ার বাসনায়, পূর্ণমাত্রায় স্বাগ্রহে এ তারাবীহ্ পালন করতে হবে। এ নয় যে, তারাবীহ্ না পড়লে লোকে কী বলবে, কিংবা আর পাঁচজন পড়ে দেখাদেখি আমিও পড়ি, কিংবা শরীর সুস্থ রাখার এক অনুশীলন। এ ধরণের চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারাবীহ্ পালন বিফল হবে। তাই নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''বহু কিয়ামকারীর ভাগ্যে ক্লান্তি ছাড়া কিছুই জুটবে না'' *(ইবনু মাজাহ্ ঃ ১৬৯০, হাদীস হাসান সহীহ্)*।

তারাবীহ্র প্রতিদান ঃ তারাবীহ্র বিধান শুধু আনুগত্যের জন্য নয়, বরং এ এক এমন অনুগ্রহ ও উপহার যার মাধ্যমে পূর্বের সকল ছোটো অপরাধ মাফ হয়ে যায়। হাদীসের বাক্য — غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ (পূর্বের পাপ, করে দেওয়া হয় মাফ) দেখে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে সাগীরা ও কাবীরা (ছোটো-বড়ো) সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। এ বিষয়ে মুহাদ্দীসগণ যে অর্থ বুঝেছেন তা হল — সাগীরা (ছোটো) গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, কাবীর (বড়ো)

গুনাহ্ নয়। কাবীরা গুনাহ এমন অপরাধ যা মাফ হওয়ার জন্য তাওবাহ্ কিংবা সাজা ভোগ করতে হয়। কাবীরা গুনাহ্ বান্দার হক বিনষ্টজনিত হলে কেসাস অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যমে মার্জনা হয়। বান্দার হক বিনষ্টজনিত কাবীরা গুনাহ্ কোনো আমল তো দূরের কথা তাওবাহ্ দ্বারাও ক্ষমা হয় না।

তারাবীহ্ ফরয নয় ঃ তারাবীহ্ ফরয নয়, এক নফল ইবাদাত। এ ইবাদাত যে নফল এ হাদীসে সে ইঙ্গিতও নিহিত রয়েছে। আর এজন্যই ইমাম বুখারী এ হাদীসের জন্য অধ্যায় রচনা করেছেন, ''রমাযানের নফল কিয়াম ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ''। সহীহ্ মুসলিমের ১৭৪ নং হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। সেখানে তারাবীহ্ নফল হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। হাদীসটির অনুবাদ — আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ''রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিয়ামে রমাযানের জন্য আবশ্যিকতার নির্দেশ না দিয়ে সাহাবীদেরকে এর প্রতি অনুপ্রেরণা দিতেন এবং বলতেন — যে ব্যক্তি রমাযান মাসে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হয়, তার পূর্বের (সাগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়।"

তারাবীহ্র জামাআত ঃ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ্ আদায়ের রীতির গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু তিনি তা ধারাবাহিক করেন নি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একে করেন ধারাবাহিক।

একদা মধ্যরাতে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মসজিদে কিয়ামে রমাযান সম্পাদন করছিলেন। কিছু সাহাবী সুযোগ হাতছাড়া না করে তাঁর সাথে শামিল হয়ে যান। সকালে তাঁরা রাতের এ খবর ছড়িয়ে দেন। পরের দিন লোক বৃদ্ধি পায়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁদের নিয়ে জামাআত করে তারাবীহ্ আদায় করেন। সকাল বেলায় এ খবরও ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় দিন লোক আরো বৃদ্ধি পায়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহাবীদের নিয়ে এদিনও জামাআত করে তারাবীহ্ আদায় করেন। চতুর্থ দিনে ভিড় উপচে পড়ে। মসজিদ হয়ে যায় সংকীর্ণ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তারাবীহ্র জন্য এলেন না। ফজর স্বলাত শেষে সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের সংবাদ আমার অজানা নয়, কিন্তু আমি এ আশংকায় বের হইনি যে, এ স্বলাত তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হবে আর তোমরা তা আদায় করতে অপরাগ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন, আর তারাবীহ্র বিষয়টি এভাবেই (নফল হিসাবে বিনা জামাআতে) রয়ে যায় *(বুখারী ঃ রমাযানের কিয়াম করা ব্যক্তির ফযীলাত, হাদীস নং ২০১২)*।

আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফাত ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফাতের প্রথম বছর এভাবেই বিনা জামাআতে অতিবাহিত হল *(বুখারী ২০০৯)*। পরবর্তীতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবীদেরকে এ স্বলাত মসজিদে বিক্ষিতভাবে আদায় করতে দেখে এক ইমামের নেতৃত্বে আদায় করাকে উত্তম বলে মনে করেন। কেননা এ সময় ফরয হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। ফলে উবাই ইবনু কাবকে ইমাম নিযুক্ত করে জামাআত সহকারে আদায়ের ব্যবস্থা করেন *(বুখারী ২০১০)*। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নীতিকে ভিত্তি করে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রবর্তিত তারাবীহ্র ধারাবাহিক জামাআত পদ্ধতি বর্তমানে আমাদের মাঝে চালু রয়েছে।

তারাবীর জামাআতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ঃ মহিলাদের জন্য গৃহাভ্যন্তরে স্বলাত আদায় উত্তম *(আবূ দাউদ ৫৭০)*। তবে মসজিদে যেতে চাইলে বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনুমতি দেওয়ার জন্য *(বুখারী ঃ ৮৬৫, ৯০০)*। ফলে মহিলারা ইচ্ছা করলে মসজিদের জামাআতে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। হাজির হতে পারে তারাবীর জামাআতেও। কিন্তু এ শর্তগুলি বজায় রাখতে হবে — (১) পূর্ণরূপে পর্দা করে অংশ গ্রহণ করবে যেন নিজের কোনো সৌন্দর্য পুরুষদের সামনে প্রকাশ না পায়, (২) খুশবু ব্যবহার করে বের হবে না *(আবূ দাউদ ঃ ৫৬৫)*, (৩) পুরুষদের সাথে একাকার হয়ে যাবে না, (৪) অলংকারের আওয়াজ যেন পুরুষরা শুনতে না পায় *(আল্ কুরআন ২৪/৩১)*, (৫) গলার আওয়াজও পুরুষদের থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যদি এ শর্তগুলি পূরণ না করা হয় তবে স্বামী ও অভিভাবকগণ বলপূর্বক বাধা প্রদান করবেন।

তারাবীহ্র স্বলাত এক সালামে চার রাকাআত নয় ঃ তারাবীহ্র স্বলাত এক সালামে চার রাকাআত পড়ার কোনো প্রমাণ নাই। যে হাদীসকে কেন্দ্র করে কিছু ইমাম এক সালামে চার রাকাআত পড়েন সে হাদীসটি হল —

مَا كَانَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَلَا فِى غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى

عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا.

আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযান ও অন্য মাসে (রাতের স্বলাত) এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। চার রাকাআত পড়তেন, এগুলির নিখুঁত ও দীর্ঘ সময় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর চার রাকাআত পড়তেন — এগুলির নিখুঁত ও দীর্ঘ সময় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিন রাকাআত পড়তেন *(বুখারী, অধ্যায় - রমাযানের ফযীলত, হাদীস নং ২০১৩)*।

এ হাদীসের চার রাকাআত, অতঃপর চার রাকাআত দ্বারা এক সালামে চার রাকাআত পড়ার প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। বরং চার রাকাআত পড়ে একটু বিশ্রাম নিতেন এ অর্থ বহন করছে। কেননা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত হয়েছে —

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِىَ الَّتِى يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ـ اِلَى الْفَجْرِ، اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এশা থেকে (যাকে লোকেরা আতামা বলে) ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকাআত স্বলাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুই রাকাআতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকাআত বিতর আদায় করতেন *(মুসলিম ঃ অধ্যায় রাতের স্বলাত ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রাতের স্বলাতের রাকাআত সংখ্যা, বিত্‌র এক রাকাআত এবং এক রাকাআত স্বলাত সঠিক, হাদীস নং ৭৩৬-১২২)*।

বুখারীর ২০১৩ নং হাদীস ''চার রাকাআত, অতঃপর চার রাকাআত'' থেকে এক সালামে চার রাকাআত পড়ার দলীল গ্রহণকারীরা অল্প সময়ে স্বলাত শেষ করার জন্য অস্পষ্ট বিষয়কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করছেন। অথচ এ হাদীসেরই কিয়াম, রুক, সাজদা নিখুঁত ভাবে করার ফলে স্বলাত পূর্ণ ও দীর্ঘ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণটি বেমালুম উপেক্ষা করছেন। একই হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণ উপেক্ষা করে অস্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করা কতদূর প্রাসঙ্গিক একটু ভাবার জন্য অনুরোধ জানাই। অস্পষ্ট বিষয়কে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ না করে মুসলিমে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীস ''তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রত্যেক দু রাকাআতে সালাম ফিরাতেন'' এর প্রতি আমল করি। এছাড়া নিম্নের হাদীসটিও প্রতি দু'রাকাআতে সালাম ফিরানোর বিষয়টিই প্রমাণ করে। ইবনু উমার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، فَاِذَا رَأَيْتَ اَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَا مَثْنٰى مَثْنٰى؟ قَالَ اَنْ تُسَلِّمَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

''রাতের স্বলাত দুই দুই করে। ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকাআত বিত্‌র পড়ে নেবে। ইবনু উমারকে জিজ্ঞাসা করা হল — দুই দুই করে কীভাবে? (ইবনু উমার) উত্তরে বলেন — প্রতি দু রাকাআতে সালাম ফিরাবে'' *(মুসলিম, অধ্যায় - রাতের স্বলাত দুই দুই করে এবং রাতের শেষাংশে এক রাকাআত বিত্‌র, হাদীস নং ঃ ৭৪৯-১৫৯)*। 'রাতের স্বলাত দুই দুই করে' মর্মে বুখারী সহ প্রসিদ্ধ সকল হাদীসগ্রন্থে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তারাবীহ্ কয় রাকাআত ঃ রাতের স্বলাত চাই তা তাহাজ্জুদ হোক অথবা তারাবীহ্ ১১ (এগারো) রাকাআত। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন—

مَا كَانَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَ لَا فِى غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযান ও রমাযান ছাড়া অন্য মাসে এগারো রাকাআতের বেশি স্বলাত পড়তেন না (বুখারী ঃ রমাযানের ফযীলাত, হাদীস নং ২০১৩)।

উপসংহার ঃ তারাবীহ্ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক অমূল্য উপহার। একে সার্থক করতে আসুন সংশোধন করি ঈমান ও উদ্দেশ্যকে। সদা সচেতন থাকি এ পরিশ্রম যেন বৃথা না যায়। যত্নবান হই যথাযথ পালনের প্রতি।

হে আল্লাহ্! তুমি রমাযান মাসের অন্য সকল ইবাদাত সহ আমাদের তারাবীহ্‌কেও কবুল করো — আমীন।

জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার দুইদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ

সাইদুর রহমান মাদানী

সভাপতি, জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিম বাংলা

الحمد لله رب العالمين، و الصلوة و السلام على سيد الأنبياء و خاتم المرسلين. و على آله و صحبه اجمعين، و من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد : فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ": انما يخشى الله من عباده العلماء" و قال النبى ﷺ : من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين - رواه البخارى.

জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার রাজ্য, জেলা, ব্লক ও মোকামী সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সঞ্চালয়কদ্বয়, আজকের মহা সম্মেলনে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, জ্ঞান পিপাসু, দ্বীনপ্রেমী ভ্রাতৃমণ্ডলী, পর্দার অন্তরালে মা ও ভগিনীগণ।

বহু আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অশেষ ধন্যবাদ। অতঃপর আমি খুতবার মাধ্যমে যে আয়াতটি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভীতি, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাশীল কেবলমাত্র সেই বান্দারাই হবে জ্ঞানী। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মহান আল্লাহ্ যার জন্য মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

উক্ত আয়াত এবং হাদীসটির মধ্যে মানব জীবনে 'সাফল্যের মানদণ্ড' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাই হল আমার আজকের উদ্বোধনী ভাষণের বিষয়বস্তু।

সম্মানিত সুধিমণ্ডলী! নিখিল জগতে মানুষের মাঝে 'সাফল্যের মানদণ্ড' অতি ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ মানুষেরা মনে করেন যে দ্বীন ধর্ম এবং আদর্শ ও নীতি ছাড়াই টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি হলেই তারা সফল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আমি একজন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা চাকুরিজীবি হলেই আমি ধন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজস্ব পরিসরে পার্থিব সুখের কোনো উৎস হাতে পেলেই তাকে বিরাট ধরণের সাফল্য ভেবে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে আদৌ মহান আল্লাহ্‌র নিকট কোনো সাফল্য নয়, সে কথাই বুঝাতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় নাবীর মাধ্যমে। সুতরাং মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্যের মানদণ্ড হল এরকম যে, মহান আল্লাহ্ যার মঙ্গল কামনা করেন, যাকে সাফল্য মণ্ডিত জীবন দান করতে চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন, যার দ্বারা সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের পর্যালোচনা করতে পারে এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে তার মনিবের প্রতি। আল্লাহ্ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামত ভোগের জন্য হয়ে উঠে চরম কৃতজ্ঞ। অসৎ পথ মানুষকে ঠেলে দেয় মহাশক্তিধর আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের রাগ ও গোস্‌সার কবলে। তাই সে সৎ ও সরল পথের পথিক হয়ে ইহ-পরকালে ধন্য হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আদর্শহীন জীবনের ভয়াবহ পরিণাম তার মনের মাঝে বিরাজ করে তাই সে হয়ে উঠে একজন আদর্শ মানুষ। যারা এইভাবে জীবন যাপন করে তারাই আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা ও ভালোবাসার পাত্র যাদের জন্য মহান স্রষ্টা অঙ্গিকারাবদ্ধভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সমস্ত ধরণের ইহকালীন এবং পরকালীন সুখ ও সাফল্যের ভাণ্ডার।

সম্মানিত উপস্থিতি! আপনারা যারা জীবনের বহু ব্যস্ততাকে এড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মনে দ্বীনের মূল্যবান জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন তাঁদের জানাই গভীরচিত্তে শত ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আপনারা ইন্‌শাআল্লাহ্ এখন থেকে দুই দিন ধরে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের বাণীসমূহ এবং তার হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শ্রবণ করবেন যে গ্রন্থটি আদর্শহীন, নীতিহীন, বর্বর, নৃশংস, মুশরিক, আনুগত্যহীন, বিবাদ ও বিদ্বেষ প্রেমী, সুদখোর, মদখোর, মানুষদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। পাল্টে দিয়েছিল পৃথিবীর মানচিত্র। অল্প সময়ের মধ্যে আল্ কুরআনের ছত্র ছায়ায় দীক্ষিত মানুষেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র সভ্যতা নয় বরং শাসন ক্ষমতারও উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিলেন। বর্তমান সময়েও যখন বিশ্ব মানবতা চরম বিপর্যয়ের শিকার। মানুষ আস্থাহারা, দিশেহারা, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের কবলে তখন মহান গ্রন্থ আল্ কুরআনের কথা মনে পড়ে যার মধ্যে

পৃথিবীবাসীকে বিপর্যয় থেকে উত্তীর্ণ করার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। শুধু মনে পড়ছে তাই নয় বরং বিশ্ব মানবতার নানাবিধ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল্ কুরআন। তাই তো কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র অমীয় বাণীসমূহের প্রচার ও প্রসার, দিগ্‌দিগন্তে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিশাল সমাবেশের আয়োজন।

মহান আল্লাহ্, অবশ্যই আপনাদের প্রতি মঙ্গল কামনা করেছেন তাই এখানে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আমরা কামনা করব যে, আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্মেলনে আমন্ত্রিত খ্যাতনামা ও সুদক্ষ উলামায়ে কেরাম, অধ্যাপকগণ এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের তথ্যবহুল বক্তব্য শ্রবণ করুন এবং তা দিয়ে নতুনভাবে আপনার প্রিয় জীবনটিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। তাহলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সেই তাওফীক দান করো — আমীন।

আপনার সংগ্রহে রাখার মত দুটি বই

১। সহীহ্ হাদীসের আলোকে হায়েয,নেফাস ও ইস্তেহাযা অবস্থায় নারীদের করণীয় ও বর্জনীয়।
২। নির্ভেজাল ও বিষয় ভিত্তিক রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর অমৃত বাণী।

লেখক

শাইখ আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম

দাওরায়ে হাদীস ঃ জামিয়া সালাফিয়া বাহারুল উলুম পশ্চিমবঙ্গ।
কামেল (বি.এ.) থিউলজী (অনার্স), এম.এম. (এম.এ.) আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
বি.এড. - বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমান সদর মুদার্রিস - খিদিরপুর রিয়াজুল উলুম মাদ্রাসা
বারুইপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)
মোবাইল - 9732 746 155

পরিবেশনায় ঃ মিল্লাত বুক হাউস
বেলডাঙ্গা, মোবাইল ঃ 8926 616 165

জমঈয়তে আহ্লে হাদীস পশ্চিমবাংলা রাজ্য সম্মেলন - ২০১৮

তারিখ ঃ ২-৩ মার্চ, রোজ শুক্র ও শনিবার দুই দিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

আল্হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন অস্সলাতু অস্সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ - বিসমিল্লাহীর রাহীম।

যাবতীয় স্তব-স্তুতি, গুণগান, গুণকীর্তন সেই মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি আজ ২রা ও ৩রা মার্চ শুক্র ও শনিবার ২০১৮ রাজ্য সম্মেলনে আসার জন্য সুস্থ দেহ, মন ও সময় দানে ধন্য করেছেন। আল্ হামদুলিল্লাহ্।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি, যিনি গোটা বিশ্বের রহমত স্বরূপ প্রেরিত।

সম্মানীয় সুধী, আজ এই সম্মেলন থেকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বালাকোটের শহীদানদের, সেই সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত অমর শহীদদেরকেও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাছাড়া ঐ সমস্ত বরেণ্য উলামাদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা নিজেদেরকে আহ্লে হাদীস বলে গর্ববোধ করছি, তাঁরা হলেন পশ্চিম বাংলার স্মরণীয় বরণীয় উলামাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের আবুল কাসেম গঙ্গাপ্রসাদী, মাওলানা ইয়াসিন সাহেব, মাওলানা সুলতান আহমেদ, মাওলানা কুসুমুদ্দিন সাহেব, বর্ধমান জেলার কুলসোনার নিয়ামাতুল্লাহ্, তাঁর জামাই সাদমানি সাহেব ও আবু তাহের বর্ধমানী সাহেবকে, উত্তর ২৪ পরগণার মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা আব্বাস আলী সাহেবকে, নদীয়ার আলিমুদ্দিন সাহেবকে, বীরভূমের আব্দুল্লাহ্ নদবী, আতাউল্লাহ্ রহমানী, মাওলানা দোস্ত মুহাম্মাদ নদবী, মাওলানা ইবরাহীম সাহেব প্রমুখকে। আজ আমরা আহ্লে হাদীসদের ইতিহাসের এক স্মরণী মুহূর্তে এ সম্মেলন থেকে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাঁদের সাথে সাথে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে কবুল করে নিন — আমীন।

ভূমিকা ঃ মানুষ মাত্রই আদম সন্তান। সৃষ্টিগতভাবে আমরা

সবাই একই উপাদানে সৃষ্ট। সকলের সৃষ্টিকর্তাও একজন। কিন্তু আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন শৈলী ভিন্ন। কেউ ডাকে এক স্রষ্টাকে, তো কেউ ডাকে তিনজনকে। আবার কেউ একজন স্রষ্টাতে বিশ্বাস রাখলেও ডাকে অসংখ্য সত্ত্বাকে। এভাবে আকীদা বা বিশ্বাসগত ভাবে মানুষ অসংখ্য ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্রষ্টার প্রেরিত বিধানের পাশাপাশি মানব রচিত অসংখ্য মত ও পথ বিদ্যমান। বিশ্ব মানব আজ বহুধাভাবে বিভক্ত। স্রষ্টাকে মানার উদ্দেশ্য সুখ-শান্তি। অজস্র মানুষ খুঁজছে সেই কাঙ্খিত সুখ ও শান্তির কুঞ্জবন। দিগভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে যুগে যুগে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নাবী ও রসূলকে। নূহ (আলাইহিস্ সালাম) থেকে নিয়ে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। বিগত প্রত্যেক নাবী ভবিষ্যত নাবীর আগমন বার্তা শুনিয়েছেন। কিন্তু আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে শেষ এবং চূড়ান্ত নাবী ও রসূল বলে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন এবং মানবতার জন্য আর কোনও নাবী বা রসূলের আগমন ঘটবেনা। এ উম্মতের জন্য তাঁকে করে পাঠালেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী। তিনি চলে গেছেন, তবে রেখে গেছেন তাঁর জীবনাদর্শ। তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি দুটি জিনিস, যতদিন তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা পথহারা ও দিশেহারা হবে না, একটি আল্লাহ্‌র কিতাব অন্যটি আমার জীবনাদর্শ।" আজ অধিকাংশ মানুষ তাঁর জীবনাদর্শ থেকে বহু দূরে। যার জন্য মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত। তাই, সার্বিকভাবে তাঁর জীবনাদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরতে আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন অর্থাৎ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের 'রাজ্য সম্মেলন ' ২০১৮।

আমাদের পরিচিতি ঃ আমরা আমাদেরকে আহ্‌লে হাদীস বলে গর্ববোধ করি। কারণ, আহ্‌লে হাদীস শব্দের অর্থ হাদীসের অনুসারী। আল্লাহ্ কুরআনকে বহু জায়গায় হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। শরীআতের পরিভাষায় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলে। সহজ সরল কথা হলো, দ্বীনের বিষয়ে যারা মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌কে মেনে চলতে চায়, তারাই আহ্‌লে হাদীস। আমরা জানি, বিগত দিনের নাবী ও রসূল মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু মৃত্যু হয়নি তাঁদের কিছু অনুসারীদের। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চলে গেছেন, তবে রেখে গেছেন আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি উজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাতটাও দিনের মত। কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ হিজরী ৩৭ সনে শুরু হলো মুসলিম সমাজের বিভক্তি। ইসলামের নামে তৈরি হল খারিজি, মুরজিয়া সহ অসংখ্য ইসলাম ধ্বংসকারী দল। তৎপরবর্তীতে জন্ম নিল আহলুর রায় বা আহলুল বিদআ। প্রত্যেকেই নিজস্ব মত ও পথকে প্রাধান্য দিলো, কেউবা বিভিন্ন ইমাম ও ব্যক্তিদের। এমনিভাবে মুসলিম সমাজ বহুধা দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ 'তোমরা একতাবদ্ধভাবে আমার রজ্জুকে ধারণ করো' উপেক্ষিত হয়ে এভাবেই মতাদর্শগত পার্থক্যে তৈরি হলো হাজারো দল উপদল। ইসলামকে ধ্বংস করতে মুসলিম সমাজেই জন্ম নিল জিন্দিক দল বা গোপন শত্রু। যারা মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে সচেষ্ট হলো, মুসলিম সমাজ তাদের গোপন অভিসন্ধি বুঝতে ভুল করলো। আমরা জানি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের আয়না স্বরূপ। আরও বলেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের দেহ স্বরূপ। কিন্তু কী দেখলাম আমরা। এ মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে এক মুসলিম অন্য মুসলিমের শুধু শত্রু নয়, জীবন শত্রু হিসাবে পরিণত হলো। বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সাক্ষী থাকলো পৃথিবী। যারা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেও তৎসহ সাহাবীদের সার্বিক জীবনাদর্শ সর্বান্তকরণে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করলো, সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সরল পথের প্রতি আহ্বান করে চলেছে যে বা যারা। যারা নাবীর আদর্শকে সঠিকভাবে মেনে নেয় তারাই আহ্‌লে হাদীস। আহলে হাদীস কোনো দল বা মাযহাবের নাম নয়। আহ্‌লে হাদীস একটি পথের নাম, এটি একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগ থেকে চলে আসা আল কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কাফেলার নাম। আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র পথে ধাবমান একটি শান্তিপ্রিয়, মানব হিতৈষী এবং অরাজনৈতিক গণ সংগঠনের নাম 'আহ্‌লে হাদীস'। আর 'জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলা' হল এ সংগঠনের ক্ষুদ্রতম শাখা।

আমাদের সোনালী অতীত ঃ যুগে যুগে আহ্‌লে হাদীস নীতির অনুসারীগণ সদা সর্বদা সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতি ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে

হানাদার বৃটিশ শাসন মুক্ত করতে বা পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে দেশের জন্য অকাতরে রক্ত দান করেছেন। স্বাধীনতা ইতিহাসে মীর তিতুমীর, হাজী শারিয়াতুল্লাহ্, আকরাম খাঁ, এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকী স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ যিনি ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনিও আহ্‌লে হাদীস ছিলেন। এ সংগঠন দেশ ও জাতির স্বার্থে সামর্থ অনুযায়ী সাধ্যমত কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতে সার্বিকভাবে যাবতীয় অপসংস্কৃতির মোকাবিলা করবে — ইনশাআল্লাহ্।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দিগভ্রান্ত মানুষকে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ মুতাবিক মুসলিমদের আকীদা ও আমল সংশোধন করা। আবার সামাজিক অপরাধ যেমন — সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার, পণ, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করা এবং জনগণকে সচেতন করে এসবের বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রতিবাদ গড়ে তোলা। শরীআত সম্পর্কে সচেতন করা, যুবক-যুবতীদের চরিত্র গঠন করা, সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির বাতারণ তৈরি করা, দেশ ও দশের কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা, সর্বোপরি, প্রকৃত মুসলিম ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

তাছাড়া মূলতঃ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহ্‌লে হাদীস আকীদায় বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী, তৎপর অজস্র মানুষ যারা ইসলামের সঠিক দিশা পেয়ে আকীদা ও আমল পরিবর্তন করেছে তাদের এক ছায়াতলে একত্রিত করা। জনকল্যাণ মূলক কাজের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসহায়, দরিদ্র ও বিপর্যয়পীড়িত জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত কার্য বিবরণী ঃ—

আকীদা সংশোধন ঃ আহ্‌লে হাদীস সংগঠনের চিরন্তন নীতি আকীদার সংশোধন। আমরা আহ্‌লে হাদীসরা আকীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদবাদী। ইসলামী দৃষ্টিকোণে আকীদার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, আকীদা ইসলামের মৌলিক বিষয়ও বটে। আকীদা কথার অর্থ বন্ধন। আকীদা এমন এক বন্ধন যা মৃত্যুতেও ছিন্ন হবার নয়। আকীদার মূলে আছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আরোগ্যদাতা, বিদ্যাদাতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত জানা এবং তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হিসাবে গ্রহণ করা। সুতরাং একজন মুসলিমের আকীদার সংশোধন খুবই জরুরী। আকীদা সঠিক না হলে, কোনও আমলই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না। যে মানুষ আল্লাহ্‌কে এক বলে বিশ্বাস করে সাথে সাথে কবর, মাযার, পাথর, মূর্তির নিকটে মনস্কামনা ব্যক্ত করে, প্রকৃত অর্থে এটা ইসলামী আকীদা নয়। আমাদের সংগঠন আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভ্রান্ত আকীদার সংশোধন করার লক্ষ্যে নিরন্তর ভাবে কাজ করে চলেছে।

আমল সংশোধন ঃ আহ্‌লে হাদীস জামাআত আকীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে যেমন আপোষহীন, ঠিক তদ্রুপ আমলের ক্ষেত্রে বিদ্‌আতের বিরুদ্ধেও আপোষহীন। আহ্‌লে হাদীস সংগঠন সদা সর্বদা সুন্নাহ্‌পন্থী। ইসলামের মৌল নীতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল বিদ্‌আত বর্জন। অর্থাৎ যে সমস্ত আমলের পক্ষে কুরআন অথবা সহীহ্ হাদীসের কোনো দলীল নেই তা পরিহার করা, তা আপাত দৃষ্টিতে যত ভালো হোক না কেন, তা বিদ্‌আত। সমাজে প্রচিলত বিদআতী আমলের বিনাশ সাধন তদস্থলে সহীহ্ সুন্নাহ্‌র বাস্তবায়নে আমাদের সংগঠনের কর্মীরা সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেতুবন্ধন ঃ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌পন্থী জনগণের মধ্যে সার্বিক সংযোগ সাধনে তথা সেতুবন্ধনে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়াসহ রাজ্যের যে সমস্ত জায়গায় কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌পন্থী তুলনামূলক কম সে সমস্ত জেলাতেও আমাদের সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, তন্মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার ঃ মানবতা চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখি। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সামাজিক অবক্ষয়ের করালগ্রাস থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সংগঠন সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সচেষ্ট। দেশ ও জাতি গড়ার কারিগর যুবকরা নিজেদের অজান্তে ইসলাম ও সর্বোপরি দেশের স্বপ্নকে চুরমার করে দিচ্ছে। আমাদের সংগঠন তাদেরকে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র আলোকে কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি ও ভালো মন্দের পার্থক্য নিরূপণে বিভিন্ন স্থানে

সেমিনার, ইনডোর-আউটডোর প্রোগ্রাম তৎসহ মসজিদে খুতবার মাধ্যমে আদর্শ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। আর, এ প্রচেষ্টাতে যথেষ্ট সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদেরকে যথেষ্ট আশাবাদী করে তুলছে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে নানান দূরভিসন্ধি মূলক মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা বহু মানুষকে আক্রান্ত করে চলেছে, তথাপিও আধুনিক প্রজন্মের শিক্ষিত জনমানসের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার আগ্রহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঐ সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের স্বচ্ছ বার্তা প্রদানের জন্য আমরা বিশেষভাবে কাজ করে চলেছি।

দুঃস্থ ও অসহায়দের সাহায্য প্রদান ঃ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হলো যাকাত। যাকাত প্রদান করেন ধনীরা আর তা বিতরণ করা হয় অসহায় দরিদ্র জনগণের মধ্যে। ইসলাম মানবিক ধর্ম। অসহায়দের সাহায্য মুমিন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। তবে, আমাদের সাধ অনেক, সাধ্য কম। রাজ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা যথার্থ ভাবে অসহায়দের সাহায্য করতে পারিনা। তবে তন্মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা। এ জেলা নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে যাকাত ফাণ্ড। এ ফাণ্ড মুর্শিদাবাদ জেলা দ্বারা গঠিত হলেও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাকাত দাতারা তাদের যাকাতের একটা অংশ প্রেরণ করেন। তা থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসা, মক্তব, লাইব্রেরী, তৎসহ অসহায়, অক্ষম ও দরিদ্রদের অল্পবিস্তর সাধ্যমত সাহায্য করা হয়। আমরা আশা রাখছি আগামী দিনে গোটা বাংলা থেকে যাকাত সংগ্রহ এবং তা সুষম বন্টনের মাধ্যমে অসহায়দের জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারবো — ইনশাআল্লাহ্।

আপাতকালীন ত্রাণের ব্যবস্থা ঃ খরা, বন্যা, ঝড়, তুফান, ভয়াহ অগ্নিকাণ্ডের মত বিপর্যয়ের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। আমরা সংগঠনের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে বিপর্যয় পীড়িতদের নিকটে সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে আসামের ভয়াবহ দাঙ্গা কবলিত মানুষের সাহায্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। তাছাড়া বিভিন্ন সময় মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা এবং ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যা কবলিত মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, বিহারের কিশানগঞ্জ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু ত্রাণ সামগ্রী বন্যা পীড়িতদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া উত্তর ২৪ পরগণায় ট্রাই সাইকেল ও বিভিন্ন অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছি।

ইসলামের নামে অ-ইসলামী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ঃ ইসলামের সরল পথকে কালিমালিপ্ত করার অভিপ্রায়ে ইসলামের শত্রুরা নানানভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। স্থান-কাল ভেদে তাদের কুটকৌশলও ভিন্ন। জেহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপও সেই চক্রান্তের একটি ফসল। বিভিন্ন সময়ে মুসলিম কমিউনিটি জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এক শ্রেণির মুসলিম জেহাদের নামে চালাচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। তাদের নেপথ্যে রয়েছে ইসলামী শত্রুদের উস্কানি, অথবা স্বার্থান্বেষী কিছু মুসলিম। ইসলাম কোনো প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন করে না। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও সন্ত্রাস একই পংক্তিতে বসানোর জন্য এক শ্রেণির মিডিয়া নিরন্তরভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। যথার্থ কারণ ছাড়া একজন মানুষকে হত্যা করা ইসলাম তথা আল্ কুরআন সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার সমান ঘোষণা করেছে (৫/৩২)। শুধু তাই নয়, কুরআনে বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে (২/১৯১)। যেখানে ইসলামের এই নীতিমালা, সে ইসলাম কি কখনো সন্ত্রাসী হামলার অনুমোদন দিতে পারে? তবুও আমরা সর্বপ্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সেমিনার, প্রকাশ্য জনসভা তৎসহ মসজিদে খুৎবার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছি। যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত তারা কখনো প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।

প্রতিবন্ধকতা ঃ—

সম্পদ ঃ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলা সংগঠনের নিজস্ব কোনো স্থাবর সম্পত্তি নেই। আছে মাত্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কিন্তু সেখানে জমানো কোনো টাকা নেই। আজ রাজ্য সম্মেলনের জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমাদের সাধ অনেক সাধ্য কম। অর্থাভাবে আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঃ— আমাদের সংগঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অর্থের সমস্যা। জমঈয়তের উল্লেখযোগ্য কোনো আর্থিক ফাণ্ড নেই। সাময়িকভাবে যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তখন কুপন বা বিল ছাপিয়ে জনগণের নিকট থেকে সাহায্য আদায় করা হয়। সংগঠনের স্থায়ী কোনো আয় না থাকায় চরমভাবে আর্থিক

সংকটে আমাদের ভুগতে হচ্ছে। বর্তমানে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার লোক পাওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। অর্থ ছাড়া সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব। এগুলির উন্নতির মূল সোপান অর্থ। কিন্তু জমঈয়তের হাতে সেটা নেই। তাই জনগণের দান ও যাকাতের উপর নির্ভরশীলতার কারণে জমঈয়তের কাজ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ জন্য জমঈয়ত বেতনভুক্ত যথার্থ কর্মী নিয়োগ করতে পারছে না। আপনাদের নিকটে সানুনয় আবেদন আগামী দিনে জমঈয়তের ভবিষ্যত পথকে সুগম করতে আপনাদের দান ও যাকাতের মাধ্যমে আপনাদের সংগঠনকে যথেষ্ট মজবুত করবেন।

আয়ের উৎস ঃ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার আয়ের মূল উৎস সহৃদয় সম্পন্ন জনগণের দান ও যাকাত।

স্বেচ্ছাসেবী লোকের অপ্রতুলতা ঃ যে কোনো কল্যাণকর কাজের নেপথ্যে থাকে নিবেদিত প্রাণ কিছু স্বেচ্ছাসেবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম। দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে জমঈয়ত স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট অভাব বোধ করছে। স্বেচ্ছাসেবী না পাওয়ার বড় কারণ হল মুসলিম স্কলারগণ বেশির ভাগই আর্থিক অনটনে থাকেন। তাঁরা সংসারের দায়ভারে জর্জরিত, ফলে ইচ্ছা থাকলেও স্বেচ্ছাশ্রম দিতে অপরাগ। এই জন্য জমঈয়তের কাজ ব্যাপক ব্যাহত হচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের এ সমস্যা হতে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে দাও।

স্ব-জাতীয় আলেমদের বিরোধিতা ঃ বর্তমানে জমঈয়তের কাজে সব থেকে বড় বাধা হল স্বজাতীয় আলেমদের বিরোধিতা ও অসহযোগিতা। একে তো দ্বীনের প্রতি ভক্তি নেই, তার উপর আবার আলেমদের মতপার্থক্য। আলেমদের মত পার্থক্যকেই হাতিয়ার করে, বহু মানুষ দ্বীনের প্রতি আমল করে না। বিশেষ করে কতকগুলি মাসায়েল নিয়ে এ বিভেদ। যেমন ফিতরায় টাকা না দ্রব্য, ফিতরার প্রকৃত হকদার কে? ফরয স্বলাতের পর সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দুআ, ঈদের স্বলাতের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলি নিয়ে অতীতে জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে অনেকবার মাদ্রাসার শাইখুল হাদীসদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। কোনও সুরাহা হয়নি। আবারো ইনশাআল্লাহ পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত আলেমদের নিয়ে ব্যাপকভাবে বসার পরিকল্পনা রয়েছে।

জমঈয়তের বিভক্তি ঃ জমঈয়তের ইতিহাসে সব থেকে লজ্জাজনক অধ্যায় হল বিভক্তি। একে তো সংখ্যায় কম, তার উপর আবার ভাগাভাগি। অনেকে যখন প্রশ্ন করে, আপানাদের মধ্যে এত ভাগাভাগি কেন? কারা ঠিক, কারা বেঠিক? কাদের সংবিধানের অনুমোদন আছে, কাদের নেই? তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। এক কথায় কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। আর বিস্তারিত শুনে ঠিক ভুল বিচার করার মানসিকতাও খুব কম লোকের রয়েছে। প্রশ্নটা যদি এরকম হত যে, কারা সঠিক ইসলামে রয়েছে? কারা সহীহ হাদীস মুতাবেক আমল করছে? কারা জনগণের উদ্দেশ্যে কাজ করছে? তাহলে বেশি ভালো হত। উপস্থিত দ্বীন প্রেমী মানুষের নিকটে আবেদন আপনারই পারেন বিভ্রান্ত আলেম সমাজকে একই অঙ্গনে আনতে, পারেন একই টেবিলে বসিয়ে একটা সুষ্ঠু ও সঠিক সমাধানের পথ বের করতে। সচেতন ও বুদ্ধিজীবী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নিকটে রইল আকুল আবেদন যেন তাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন এবং জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের পথকে মসৃণ করে তোলেন। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের আবেদনে সাড়া দাও।

আমরা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার পক্ষ থেকে অতীতে শাইখ আইনুল বারী সাহেব ও শাইখ ইসহাক মাদানী সাহেবের সাথে আপোষ মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উভয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল কর — আমীন।

ইসলাম সম্পর্কে অসচেতনতা ঃ ইসলাম সম্পর্কে অসচেতনতাও জমঈয়তের পথে বিরাট এক বাধা। কেননা বেশির ভাগ মানুষই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করে না। তাদের জ্ঞানের উৎস হল আলেমদের ফাতাওয়া। ফলে তারা হাদীস কুরআনে অন্বেষণ করে না, বিভিন্ন আলেমদের বক্তব্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে সাধারণ মানুষ আলেমদের চতুরতাও বুঝতে পারছে না। আবার মসলা মাসায়েলের বিভেদ নির্মূল করা সম্ভবও হচ্ছে না। হক-না হক যাঁচাই করার ক্ষমতা জনগণের থাকলে সমস্যা অনেকটাই মিটে যেত এবং আলেমদের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ হ্রাস পেত। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, বর্তমানে শিক্ষিকত যুবকরা এ বিষয়ে অনেকটাই সচেতন, তারা কুরআন ও হাদীস নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের হেদায়াত দান করো।

মাযহাবী আকীদা ঃ কুরআন হাদীস পরিহার করে, ব্যক্তি বিশেষের ফাতাওয়া মানার প্রবণতা থেকেই মাযহাবের গোড়াপত্তন। মাযহাবীরা অনেক ক্ষেত্রেই কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র বিপক্ষে নিজেদের ইমামদের মতামতকে প্রাধান্য দেন। এভাবে

তাঁরা অলক্ষ্যে ইসলামের মূল স্রোত থেকে ছিটকে গেছেন। তাঁরা তাঁদের আকীদা ও বিশ্বাসকে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার যারপরনাই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ফলে মায়হাবী ভায়েদের নিকটে সঠিক ইসলাম পৌঁছাতে জমঈয়তকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।

যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব ঃ আর্থিক অভাবের সাথে সাথে ইসলামী আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে ইসলাম শত্রুদের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অপব্যাখ্যার সঠিক জবাব দেবার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতম ব্যক্তিত্বের। সর্বোপরি সংগঠনের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যও দরকার বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের। একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিত্বরাই পারে জমঈয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শরীআতের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নির্বিশেষে সকলের নিকট তুলে ধরতে। কিন্তু জমঈয়ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাববোধ করছে। আল্লাহ্‌র নিকট করুণ প্রার্থনা হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাঝে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে আবির্ভাব ঘটাও, সাথে সাথে দেশ জাতির সার্বিক কল্যাণে কাজ করার তাওফীক দান করো — আমীন।

উত্তরণের পথ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ উপরোল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে আগামী দিনে জমঈয়ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে —

(ক) বিতর্কিত মাসায়েলগুলি নিয়ে বৃহত্তর আকারে ওলামাদের সমাবেশের আয়োজন এবং পর্যালোচনা।

(খ) সমগোত্রীয় জমঈয়ত বিরোধী মনোভাবাপন্ন আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আপস বৈঠকে বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উত্তরণের পথ অন্বেষণ করা।

(গ) মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজো যেন মাদ্রাসাগুলিকে ফিতরার অর্থের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

(ঘ) মাদ্রাসার আলেমদের সঙ্গে বৈঠক করা এবং তাঁদের জমঈয়ত বিরোধীতার কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিকারের পথ অন্বেষণ করা।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গব্যাপী যাকাত ফাণ্ডকে মজবুত রূপ দান করা যেন যাকাতদাতাদের অর্থ জেলাভিত্তিক সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং জেলা থেকে রাজ্য স্তরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠানো যায়।

(চ) দ্বীন প্রেমী ভালো ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবিদের একটা টিম তৈরী করা, যারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত জমঈয়তের খাতে দান করতে থাকবে। আপামর জনগণের নিকট থেকে দান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেন সবাই সংগঠনটিকে নিজেদের বলে ভাবতে পারে এবং তার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমও দেয়।

(ছ) যাঁরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা, তাঁরা যেন অবসর সময়ে মিল্লাতের জন্য সময় দেন।

(জ) মসজিদের ইমামদেরকে জমঈয়তের কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেন তাঁরা মসজিদের মুসল্লিদেরকে সঠিক ও সহীহ্ হাদীসের প্রতি আমল করার জন্য আহ্বান করেন এবং জমঈয়েতর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।

(ঝ) দরিদ্র, অসহায় ও বিপর্যয় পীড়িতদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জমঈয়তের রিলিফ ফাণ্ড নামে একটি পৃথক ফাণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঞ) দরিদ্র অথচ মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য জমঈয়তের যতটা সম্ভব দায়ভার নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(ট) ভবিষ্যতে জমঈয়তের ভাবধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং সর্বসাধরণের মধ্যে প্রসারিত করার লক্ষ্যে পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করা।

(ঠ) জমঈয়ত আগামী দিনে প্রাইমারী সেকসেনের জন্য সহীহ্ আকীদা সম্পন্ন শিশু মনের উপযোগী বই পত্রও প্রকাশ করা চায় যেন ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব ভাবধারা নিয়ে বাঁচতে শেখে এবং সচ্চিত্রবান ও সুনাগরিক হতে শেখে।

(ড) জমঈয়ত আগমী দিনে পশ্চিমবাংলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিগত দিনের যোগ্য আলেমদের জীবনী রচনা করা এবং সংরক্ষণ করা।

(ঢ) মদ, জুয়া, ঘুষ, পণ, ব্যাভিচারের মত অসামাজিক ও অকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো।

(ণ) জেহাদের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরো জোরদার করা এবং যুব সমাজের নিকটে জেহাদের সঠিক রূপরেখার বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ত) সামাজিক, দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় স্তরে শান্তির বাতারবণ তৈরি করতে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

(থ) ওয়েবসাইটের ও মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কর্ম তুলে ধরা।

(দ) শাখা সংগঠন তৈরি করা।

(ধ) মিডিয়া সেল তৈরি করা।

(ন) আহ্‌লে হাদীসের থিঙ্কট্যাঙ্ক তৈরি করা।

(প) শিক্ষা সেল তৈরি করা।

(ফ) স্কুল, কলেজ ও আদর্শ মাদ্রাসা নির্মাণ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ আমি আন্তরিকভাবে সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই সমস্ত জমঈয়ত কর্মীদের, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই সম্মেলন। অতঃপর সেইসব দরদী ভাইদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ যাঁরা কষ্টার্জিত অর্থ আনন্দচিত্তে দান করে এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক, আলোচক, অতিথি, পর্যবেক্ষক এবং উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের প্রতিও আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যাঁরা উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের যাঁদের আগমন সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাছাড়া বিশিষ্ট সমাজসেবী, ব্যবসায়ীগণের উপস্থিতিতেও আমরা ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি, তাঁদের প্রতিও রইলো হার্দিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সর্বোপরি প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তৎসহ তাঁদের সহকর্মী পুলিশ মহোদয়দের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্মেলনে নিরাপত্তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে সাংবাদিক বন্ধুদের ও মা-বোনদেরও। হে আল্লাহ্! তুমি এ সম্মেলনকে আমাদের সকলের জন্য আখেরাতের পাথেয় করো — আমীন।

উপসংহার ঃ ন্যায় না থাকলে অন্যায় বাসা বাঁধবে, সত্য না থাকলে কুসংস্কারের আগমন ঘটবে, অপরাধ দমনের ব্যবস্থা না থাকলে অপরাধের দৌরাত্ব দেখা যাবে, বিচার না থাকলে অবিচারের বাড়বাড়ন্ত থাকবে, অপশাসন মাথা চাড়া দেবে এবং সর্বোপরি ইসলামী আকীদ ও আমল না থাকলে অইসলামী আকীদা ও আমল স্থলাভিষিক্ত হবে — এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলা ইসলামী সমাজ সংস্কারের যে ধারা অবলম্বন করেছে, আগামী দিনেও সেই ধারাকে সচল রাখতে যারপরনাই প্রচেষ্টা চালাবে এবং একাজে জমঈয়ত কর্মীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, নদীর উচ্চ গতিতে কখনো বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয় না। বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয় নদীর নিম্নগতিতে যেখানে স্রোতের গতিবেগ হ্রাস পায়। আল্লাহ্ বলেন, ‘‘সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েই থাকে’’ (সূরা ইসরা -৮১)।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকটে করজোড়ে নিবেদন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে জমঈয়তের মিশন ও ভিশনকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুবুদ্ধি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা দাও, আমাদের বিপদে ধৈর্যধারণ করার শক্তি ও সাহস দাও, তোমার গায়েবী মদত আমাদের জন্য প্রেরণ করো এবং সর্বোপরি আখেরাতের সুশীতল সুখময় জান্নাতের সমস্ত পথ উন্মুক্ত করে দাও — আমীন।

রাণা ফার্নিচার

প্রোঃ - নজরুল ইসলাম দফাদার

হাসপাতাল রোড

(জুম্মা মসজিদের সামনে)

নতিডাঙ্গা , নদীয়া

MOBILE NO.

9733902120, 6294378256

এখানে বিদেশি মেশিন ও উন্নতমানের সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্ন সহকারে কোনো রকম ডুপলিকেট ছাড়া বিশ্বস্ত মালিকের তত্ত্বাবধানে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করা হয় এবং সমস্ত রকম কাঠের ফার্নিচার অর্ডার সহ বিক্রয় করা হয়।

ইসলামের মানবিক দৃষ্টিকোণ - বিশেষভাবে অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহার

মোঃ কুতুবুদ্দীন

الحمد لله وحده و الصلوٰة و اسلام على من لا نبى بعدة ـ اما بعد

অশান্ত পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ জনতার আর্ত চিৎকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে উন্মুক্ত গগনের মুক্ত পবন আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বে কোটি কোটি অভুক্ত বনু আদমের অমানবিক জীবন প্রবাহের নিদারুন চিত্র সচেতন মানুষকে ব্যথিত করেছে। পাশাপাশি তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ডামাডোলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মারণাস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আজ বিবেকবান সকল মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু ইসলাম স্থান-কাল-দেশ-জাতি ভেদে সকল শ্রেণির মানুষকে মানবিক হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, রাজা-বাদশাহ, মুসলিম, ইহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলকেই সমান করে দেখার ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আল্ কুরআনের ঘোষণা —

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ ঃ যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করে, তার পক্ষ থেকে কখনোও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত (সূরাহ্ আল ইমরান ৮৫)।

ইসলাম কতখানি মানবিক হতে নির্দেশ দেয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ্‌র এই কথায় —

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا .

অর্থ ঃ তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র আর তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পাশ্ববর্তী সহচর পথিক এবং তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না (সূরাহ্ নিসা ৩৬)।

ইসলাম লোকজনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ কোনো পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। সম্ভবতঃ ওরা বিদ্রুপকারীদের থেকে ভালো হতে পারে। আর কোনো নারী যেন অন্য নারীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। সম্ভবতঃ ওরা বিদ্রুপকারিণীদের থেকে ভাল হতে পারে। তোমরা একজন আরেকজনকে দোষারোপ করো না এবং একজন অপরজনকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনার পর অসৎ কাজ করা কতই না খারাপ। আর যারা তওবা করে না তারাই অত্যাচারী (সূরাহ্ হুজুরাত ১১)।

ইসলাম মানবিকতা দেখাতে পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ বলেন —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে দূরে থাক, কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা অন্যের গোপন বিষয় অন্বেষণ করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করাকে পছন্দ করবে? না, তোমরা একে অপছন্দই করবে। ভয় করো আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও দয়াবান (সূরাহ হুজুরাত ৩২)।

ইসলাম জাত ও বর্ণের পার্থক্য করে না। আল্লাহ্ বলেন —

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ ঃ হে লোক সকল আমি তোমাদের নর ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্য হতে সে-ই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও দক্ষ (সূরা হুজুরাত ১৩)।

ইসলাম সকলকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহ্ বলেন —

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ ঃ বলুন, হে কিতাবধারীগণ, এসো এমন একটি বাণীর দিকে যেটি আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আমরা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করি। আর আমাদের একজন অন্যজনকে রব হিসাবে গ্রহণ না করি। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা হচ্ছি মুসলিম (সূরাহ্ আল্ ইমরাণ ৬৪)।

ইসলাম শুধু মানুষ কেন বরং কুকুরের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَمَلَاَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقٰى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

অর্থ ঃ আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমনই মুহূর্তে তার প্রচণ্ড পিপাসা অনুভূত হলে সে কূপে নেমে পানি পান করল। তারপর কূপ থেকে বের হয়ে দেখল একটা কুকুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভিজা মাটি চাটছিল। সে বলল, যেভাবে আমার তৃষ্ণা পেয়েছে সেভাবে এ কুকুরেরও তৃষ্ণা পেয়েছে। তাই সে তার চামড়ার মোজা ভরে পানি নিল এবং চামড়ার মুখ বন্ধ করে উপরে উঠল আর কুকুরকে পানি খাওয়াল যার ফলে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের জন্য কি পশুতেও সওয়াব রয়েছে? আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক জীবন্ত কলিজা বিশিষ্ট প্রাণীতে সওয়াব রয়েছে (বুখারী হাঃ ২৩৬৩)।

যে ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করে ইসলাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاُنَحِّيَنَّ

هٰذَا عَنِّ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ.

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি মুসলিমদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিব, যেন তারা কষ্ট না পান। (আর ওটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল) যার ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৯০৪)।

মানুষ কেন বরং কোনো প্রাণীর উপরও যুলুম করা ইসলামে অবৈধ। আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَ سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَ لَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ.

অর্থঃ একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে। তাই সে মারা গেছে। ফলে মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। মহিলাটি যখন বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে, তখন তাকে খেতেও দেয়নি এবং পান করতেও দেয়নি। এমনকী তাকে মাটির কীট-পতঙ্গও খেতে দেয়নি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৯০৩)।

ইসলাম কতখানি মানবিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রমিকের অতি দ্রুত তার মজুরী প্রদানের মাধ্যমে।

عن عبده الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ اُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ.

আব্দুল্লাহ বিন ওমার বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই মজুরী প্রদান কর (ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ২৯৮৭)।

ইসলামের উদারতা ও মানবিকতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — The Mohammadan conquest of Islam came as solvation to the down trodden, to the poor, that is why one fifth of our people have become Mohammedans. It was not the sword that did it all. It would be madness to think that it was all the work of sword and fire. অর্থাৎ নির্যাতিত, দরিদ্র মানুষদের মুক্তির সমাধানে মুসলিমদের ভারত জয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেজন্য আমাদের এক পঞ্চমাংশ জনগণ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এটা তরবারির জোরে হয়নি। এসব কাজ তরবারি ও হিংসা তথা আগুন দ্বারা হয়েছে ভাবাটা নেহাতই পাগলামি।

ইসলাম শুধু মুসলিমদের জন্যই মানবিক হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয় না বরং তা অমুসলিমদের ব্যাপারেও যথেষ্ট উদার। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ اَنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায় (বুখারী, মিশকাত ৩৪৫২)।

অমুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۔

অর্থঃ হে নাবী! কোনো মুশরিক যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে তাকে আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও। তারপর তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও (সূরাহ্ তওবাহ ৬)।

অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী যখন ইসলামী দায়িত্বশীলের কাছে আশ্রয় প্রার্থী হবে তখন ইসলামী বিধান অনুযায়ী আশ্রয় বা ফয়সালা দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ .

অর্থঃ তারা যদি তোমার কাছে আসে, হয় তাদের বিরোধ

মিটিয়ে দাও, অথবা তাদের ব্যাপারে তুমি নির্লিপ্ত থাক। তুমি যদি নির্লিপ্ত থাক, তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের বিরোধ মিটিয়ে দাও তবে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করো (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৪২)।

মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক এক খ্রিস্টান ব্যক্তি একটি লোহার বর্ম বিক্রি করছে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তৎক্ষণাৎ বর্মটি চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম তো আমার। চলো আদালতে তোমার ও আমার মধ্যে ফায়সালা হবে। সে সময় আদালতের বিচারক ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন আমীরুল মুমিনীনকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজ স্থানে বসিয়ে তিনি তাঁর পাশে বসালেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিচারপতি শুরাইহ্‌কে বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে দিন। শুরাইহ্ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য কী? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এই বর্মটি আমার। অনেকদিন হল এটি হারিয়ে গেছে। আমি তা বিক্রি করিনি, দানও করিনি। শুরাইহ্ বললেন, ওহে খ্রিস্টান, আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে বলল আমি আমিরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি না, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ্ বলল, বর্মটি তো ঐ ব্যক্তির অধিকারে রয়েছে, কোনো প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে সেটা নেওয়া যাবে বলে আমি মনে করিনা। আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে কী? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হেসে ফেললেন এবং বললেন শুরাইহ্ ঠিকই বলেছেন। আমার নিকট তো কোনো প্রমাণ নেই। নিরুপায় শুরাইহ খ্রিস্টানের পক্ষেই রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে রওয়ানা হলো। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে আবার ফিরে এলো এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটাই নাবীদের বিধান ও শিক্ষা। আমিরুল মুমিনীন নিজের দাবী বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কসম! হে আমিরুল মুমিনীন, এটা আপনারই বর্ম। আমি এটা আপনার কাছে বিক্রয় করেছিলাম। পরে তা আপনার মেটে রঙের উটটির উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলে আমি ওটা তুলে নিই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি যখন মুসলিম হয়ে গেলে তখন এ বর্ম এখন থেকে তোমার। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ভালো দেখে একটা ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন (বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ১০/১৩৬ হা/২০২৫২, বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৫)।

এ থেকে বুঝা যায় যে, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ-গোষ্ঠীগত পার্থক্য করা যাবেনা। ন্যায় বিচার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন —

يَـاَيُّهَـاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَـجْـرِمَـنَّـكُـمْ شَـنَـاٰنُ قَـوْمٍ عَـلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই আল্লাহ্‌র ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত (সূরাহ্ মায়েদাহ ৮)।

বিশ্ব মানবতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৯৪৭)।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

وَ اللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَ اللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَ اللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সে

কে? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২)।

ইসলামের মানবিক দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে অমুসলিমদের সাথে তার একটি প্রমাণ —

عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عَمْرٍ و ذُبِحَتْ لَهٗ شَاةٌ فِىْ اَهْلِهٖ فَلَمَّا جَآءَ قَالَ اَهْدَيْتُم لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ اَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يوصِيْنِىْ يَا لَجَا رِحَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ.

অর্থ ঃ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য তার পরিবারে ছাগল যবেহ করা হল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু মাংস পাঠিয়েছ? তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু মাংস পাঠিয়েছ? আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, আমাকে জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) প্রতিবেশীর ব্যাপারে সর্বদা উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকী আমার এ ধারণা সৃষ্টি হল যে, তিনি তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়ে ছাড়বেন (তিরমিযী ১৯৪৩)।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন —

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ.

অর্থ ঃ তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৯৬৯)।

অমুসলিমদের সঙ্গে ইসলামের মানবিক দৃষ্টিকোণের অন্যতম একটি দিক হল, অন্যান্য ধর্মে যে সব দেবদেবী আছে যাদেরকে ইসলাম সমর্থন করে না, তাঁদের সম্বন্ধেও কোনো কটু বাক্য বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমদের উপাস্যকে গালি দিলে সেও প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে মুসলিমের উপাস্য তথা আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। আল্লাহ্ বলেন —

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থ ঃ তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাঁদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দেবে (সূরা আনআম ১০৮)।

সুতরাং অমুসলিম কর্তৃক আল্লাহ্‌কে গালি দেওয়ার বিষয়ে ঐ মুসলিমই দায়ী। তাছাড়া একজন মুসলিম দৈনন্দিন স্বলাতের শেষ পর্যায়ে ডানে-বামে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তার চারপাশে অবস্থিত সকল প্রকার জীবের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনা করে থাকে। আপন প্রার্থনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মঙ্গল কামনার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার এই চূড়ান্ত নিদর্শন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ইসলাম শুধু মুসলিমদের ধর্ম নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শুধু মুসলিমদের নাবী নন, সমগ্র মানব জাতির নাবী তথা বিশ্বনাবী।

তাই আসুন আমরা সকলে উক্ত বিষয়টিকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং সেই মতো আমল করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের সেই মতো আমল করার তাওফীক দান করুন — আমীন।

দু'জন যোগ্য আলেম চাই

যোগাযোগের ঠিকানা

বারবারপুর ইসলামিক মডার্ণ পাবলিক স্কুল

গ্রাম ও পোঃ - বারবাকপুর

থানা করিমপুর, জেলা - নদীয়া

সম্পাদক ঃ ছানারুল ইসলাম

Mob No. : 7585845725 / 9153918924

আবেদনের শেষ তারিখ ঃ 15.05.2018

ইসলাম কি তরবারীর দ্বারা প্রসারিত হয়েছে?

আন্ওয়ারুল হক ফাইযী

অনেকেই প্রশ্ন করে যে ইসলামকে শান্তির ধর্ম কীভাবে বলা যায় যখন তা তরবারীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে?

অমুসলিমদের অনেকেই এই অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতার বলে ইসলাম প্রচার না হলে সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলিম থাকা সম্ভব নয়। তাদের এই কথাগুলো অজ্ঞতার ফসল কিংবা হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ সত্যের অপলাপ। অবশ্য অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ সত্যকে শুধু স্বীকারই করেননি; বরং তাদের দাবিকে মিথ্যা বলেছেন যেমন স্যার পি.সি. রায়, পি.কে. হিট্টি, থমাস আর্নল্ড এবং টমাস কার্লাইল প্রমুখ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল ইসলামের প্রসার সংক্রান্ত ভুল ধারণার ব্যাপারে বলতে গিয়ে লিখেছেন, ''সত্যই তলোয়ার, কিন্তু কোথায় পাবে সেই তলোয়ার? প্রত্যেক নতুন চেতনাই কেবলমাত্র একজন মানুষের মননের ক্ষুদ্র পরিসরে বেড়ে উঠে - আর সেখানেই লালিত পালিত হয়। সারা পৃথিবীর সকল মানুষের বিপক্ষে সেই একজনই তখন রুখে দাঁড়ায়। একটি তরবারী নিয়ে তখন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।''

মুসলিমরা প্রায় ১৪০০ বছর ধরে আরব শাসন করেছে। তথাপি এখনও আরবে ৯ মিলিয়ন খ্রিস্টান রয়েছে। যদি মুসলিমরা তরবারীর মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার করত তাহলে আরবে একজনও খ্রিস্টান থাকত না। অনুরূপভাবে ৮০০ বছর স্পেন এবং ৭০০ বছর ধরে মুসলিমরা ভারত শাসন করেছে। বিশ্বের জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থান করছে। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ জনগন মুসলিম। কেউ বলতে পারে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল? একইভাবে ইসলাম আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বিস্তার লাভ করেছিল। কেউ বলতে পারে, ইসলাম যদি সত্যই তরবারীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল?

১৯৮৬ সালের 'আলমানাক' রিডার্স ডাইজেস্ট-এর একটি নিবন্ধে ১৯৪৩ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত — এই চল্লিশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ধর্মগুলোর প্রসারের উপর একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। তাতে সবার উপরে ছিল ইসলাম, যার প্রসার হার ছিল ২৩৫% এবং খ্রিস্টান ধর্ম, যার প্রসার হার ছিল মাত্র ৪৭%। কেউ কি বলতে পারে এই শতকের কোন্ তরবারী তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আজ আমেরিকা ও ইউরোপে সবচেয়ে দ্রুত প্রসার পাওয়া ধর্মের নাম ইসলাম। কোন তরবারী পশ্চিমাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে? আজ কোন্ তরবারী চীনাদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করছে? আসলে 'সত্যই' তরবারী, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছে। আর তরবারী ও শক্তির মাধ্যমে মানুষের মাথা নোয়ানো যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না।

ফ্রান্সের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক গোস্তাফ লোবন 'আরব সভ্যতা' নামক গ্রন্থে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ইসলামের বিস্তৃতির গূঢ় রহস্য ও বিভিন্ন এলাকা বিজিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, কোনো ধর্ম শক্তি দিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। ইসলামও তদ্রুপ তরবারী কিংবা শক্তি প্রয়োগ করে বিস্তৃত হয়নি; বরং ইসলাম দাওয়াত উপস্থাপনের দ্বারাই বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুধুমাত্র দাওয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে তুর্কী ও মোঘল সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে; অথচ আগে তারা আরবদের উপর কর্তৃত্ব করত।

ডক্টর জোসেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন, যারা আশঙ্কা করছে আণবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে, তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটা পড়েছে সেদিন যেদিন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জন্ম নেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে রিসালাত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর নাবী-রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। ইসলাম কোনো মানুষের চিন্তা-ভাবনার ফসল নয়; বরং তা অনাদি-অনন্ত মহাবিজ্ঞানী বিশ্ববিধাতা আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত দ্বীন (জীবন বিধান)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

و ما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى.

অর্থঃ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মনগড়া কথা বলেন না। যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয় (সূরা নাজম ৫৩/৩-৪)।

এই অহীর জ্ঞানই হল সেই তরবারী যা মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে এবং আজও সত্যানুসন্ধানী, সৎ ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে এরই মাধ্যমে বৃহত্তম জিহাদ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন و جاهدهم به جهادا كبيرا

অর্থঃ হে নাবী! তুমি কুরআন নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করো (সূরা ফুরকান ২৫/৫২)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর ২৩ বছর রিসালাতী জীবনের মধ্যে সুদীর্ঘ মূল্যবান ১৪টি বছরই অস্ত্রবিহীন এই 'অহী' নামক জ্ঞান তরবারী নিয়ে বৃহত্তম জিহাদ করেছেন। ফলে নিরীহ, দুর্বল, ন্যায়-নিষ্ঠাবান, সৎ ও সত্যানুসন্ধানী লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতেন তাঁরাই এই জ্ঞান তরবারী নিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করতেন। কিন্তু যারা দাম্ভিক ও অহংকারী ছিল তারা মুসলিমদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দিল, অনেককে শহীদ করে দিয়েও তাদের ইসলাম বিমুখ করতে পারল না। যতদিন যায় মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এদিকে দাম্ভিক-অহংকারী কাফের ও মুশরিকদের ক্রোধ আরও প্রজ্জ্বলিত হতে লাগলো এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেও মেরে রক্তাক্ত করে দিল। ত্বারিক বিন আব্দুল্লাহ্ আল্ মুহারিবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের এক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে যুলমাজায বাজারে দেখেছি। তাঁর গায়ে লাল রঙের পোষাক ছিল। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''হে লোকেরা! তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ্' সফল হবে।'' আর তাঁর আপন চাচা আবূ লাহাব তাঁর পিছু নিয়ে তাঁকে পাথর মেরে তাঁর দু জঙ্ঘা ও গোড়ালি রক্তাক্ত করে দিয়ে বলেছিল, ''হে লোকেরা তোমরা তাঁর অনুসরণ করো না, কারণ সে একজন মিথ্যাবাদী'' (সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৬৫৬২, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ ১৫৯)।

অথচ আবূ লাহাব সহ কুরাইশগণই মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে তাঁর নাবী হওয়ার আগে চরম আমানতদার ও সত্যবাদী হিসাবে বিশ্বাস করত। যেমন, একদা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাফা পর্বতে আরোহণ করে আবূ লাহাবসহ কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে জমায়েত করে বলেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রু সৈন্য উপত্যকায় চলে এসেছে, তারা তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি (বুখারী ৪৭৭০, সহীহুল জামি ৭৯০২)। আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই (বুখারী ৪৯৭১, মুসলিম ২০৮)। আর সত্যানুসন্ধানী, ন্যায় পরায়ণ, সরল ও নিরীহ ব্যক্তিদের কাছে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সত্যাবাদিতা ও আবূ লাহাবদের মিথ্যাবাদীতা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ছিল। ফলে তাঁরা আবূ লাহাবদের কথায় কর্ণপাত না করে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করলেন। এদেখে কাফেররা তাদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। এমনকী তারা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেই হত্যার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সকলের অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাআলা অহী মারফত তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম), আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৪৫০ কিমি দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছালেন। এদিকে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মদীনা পৌঁছানোর আগেই দ্বীন ইসলাম মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি যখন মদীনায় পৌঁছালেন তখন মদীনার লোকেরা বলতে লাগলো — جاء نبى الله جاء نبى الله ﷺ

অর্থঃ আল্লাহ্র নাবী এসেছেন, আল্লাহ্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এসেছেন। লোকজন উঁচু স্থানে উঠে দেখতে লাগল, আর বলতে লাগল আল্লাহ্র নাবী এসেছেন, আল্লাহ্র নাবী এসেছেন।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাড়ির পার্শ্বে গিয়ে অবতরণ করলেন। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন। তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন। তিনি শীঘ্র ফল সংগ্রহ হতে বিরত হলেন এবং সংগৃহীত খেজুরসহ নাবী

(সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট হাজির হলেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। অতঃপর যখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তখন পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন এবং বললেন —

" اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ "

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইয়াহুদী সম্প্রদায় জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার পুত্র। আমি তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি জ্ঞানী এবং তাদের সব থেকে বেশি জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি একথা তাদের জানার আগেই আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলীক কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তোমরা সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যিনি ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি সত্য রসূল, সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। তারা উত্তর দিল, আমরা তা জানি না। তারা একথা তিনবার বলল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পণ্ডিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পুত্র। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমাদের মতামত কী হবে? তারা বলল, আল্লাহ্ হিফাযত করুন, কিছুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। এ কথাগুলো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তাদের মাঝে তিনবার বলাবলি হল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, হে ইবনু সালাম! তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো। তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে ইয়াহুদী

পরবর্তী অংশ ২৭ পাতায়

সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

আভিধানিক অর্থ ঃ

السنة لغة : السيرة و الطريقة حسنة كانت أو قبيحة.

আভিধানিক অর্থে সুন্নাত বলা হয়, আচার আচরণ এবং ত্বরীকা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতিকে তা ভাল হোক অথবা মন্দ। যেমন — আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اِنْ يَعُوْدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ.

অর্থ ঃ তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বল, যদি তারা (কুফরী ও অবিশ্বাস থেকে) বিরত হয়, তাহলে অতীতে তাদের যা (পাপ) হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে পূর্ববর্তীদের (সাথে আমার আচরিত) রীতি তো রয়েছেই (সূরাহ্ আনফাল ৮/৩৮)।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. .....

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভাল রীতি চালু করলো সে তার সওয়াব পাবে এবং তারপরে যারা এর উপর আমল করবে তাদের সাওয়াবও সে পাবে। অথচ এদের সাওয়াব থেকে কিছু কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতি চালু করলো ..... (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬৯)। উক্ত হাদীসে ভাল নীতি ও মন্দ নীতি উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সুন্নাত শব্দ।

(২) এবং পারিভাষিক অর্থের দিক দিয়ে সুন্নাত শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার করা হয় ঃ

(ক) হাদীসের অর্থে, হাদীসের সংজ্ঞা, ডাঃ মাহমূদ তাহ্হান বলেন —

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ سَلَاةٍ.

অর্থ ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে তাদেরকে প্রত্যেক স্বলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৮৮৭)। এখানে মিসওয়াক (দাঁতন) করার ইসলামে কী মর্যাদা আছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল সুন্নাত অজেব নয়।

(ঘ) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধের জন্য তিনি বলেন —

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

..... সুতরাং এটাই আমার সুন্নাত (পথ), যে ব্যক্তি আমার পথ থেকে বিমুখ হবে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী ৫০৬৩)। এখানে সুন্নাতের অর্থ হল, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পথ ও পদ্ধতি। কেউ যদি তাঁর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে সে তাঁর উম্মাতে গণ্য হবে না।

(৩) সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

আল্লাহ্ তআলা বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)।

তিনি আরো বলেন —

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা (সূরাহ্ তাগাবুন, ৬৪/১২)।

তিনি আরো বলেন —

ما اضيف الى النبى ﷺ من قول او فعل او تقرير او صفة.

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, মৌনসম্মতি এবং গুণাবলীকে হাদীস বলে (তায়সীরু মুস্তালিহিল হাদীস ১/৯)।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ.

অর্থ ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা সে দুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না (মুয়াত্তা ইমাম মালিক হাঃ ৩৩৩৮, সূত্র হাসান, আল্লামাহ্ আলবানী এবং হাফেয যুবায়ের হাসান বলেছেন)।

(খ) বিদআতের বিপরীত অর্থে —

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

সুতরাং এমতাবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাতকে ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেকটা নতুন (কথা ও কাজের) উদ্ভাবন থেকে সাবধান থাকবে কেননা দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেকটা নতুন (কথা ও কাজ) বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৪২, সূত্র হাসান, ইবনু হিব্বান সূত্র হাসান, আলবানী, শুয়াইব আরনাঊত স্বহীহ এবং হাফেয যুবায়ের হাসান বলেছেন)।

(গ) কোনো দ্বীনী কাজের স্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ : اُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ، اُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ.

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি সওম রাখেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সওম রাখে। কুরাউল গামীমে পৌঁছানোর পর তাঁকে বলা হয়, তিনি আরো বলেন, লোকেদের জন্য সওম রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আপনি কী করেন তারা সেই অপেক্ষায় আছে। আসরের স্বলাত আদায়ের পর তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা উপুড় করে পান করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। ফলে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক সওম ভেঙ্গে দিল এবং কিছু লোক সওম থাকল। তখনও কিছু লোক সওম অবস্থায় আছে এ কথা তাঁর নিকটে পৌঁছালে তিনি বললেন, এরাই অবাধ্য, এরাই অবাধ্য (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১১১৪)।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا مَثَلِى وَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ : يَا قَوْمِ، اِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ، وَ اِنِّىْ أَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوْا، فَانْطَلَقُوْا عَلَى مَهَلِهِمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَ كَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি, আমার এবং আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মত যে তার কাউমের কাছে এসে বলল, হে আমার কউম! আমি আমার দুই চোখে শত্রু বাহিনী দেখে এলাম। আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য (নিঃস্বার্থ) সাবধানকারী। অতএব তোমরা শীঘ্রই তোমাদের

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

অর্থঃ যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি (সূরাহ্ নিসা ৪/৮০)।

وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا.

আর যে কেউ আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিনে) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম (সূরাহ্ নিসা ৪/৬৯)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

كُلُّ اُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَ مَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِى فَقَدْ اَبَى.

অর্থঃ আমার উম্মাতের সমস্ত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু তারা নয় যারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্ রসূল! এমন কে আছে যে, জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উত্তরে বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে (সহীহ্ বুখারী ৭২৮০)।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلَى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ

মুক্তির পথ খোঁজ কর (তাহলে মুক্তি পাবে) একথা শুনে জাতির একদল লোক তাঁর কথা (বিশ্বাস করে) মেনে নিল। রাতেই তারা সেখান থেকে চলে গেল এবং তারা মুক্তি পেল। আর এক দল তাঁকে মিথ্যুক মনে করে সেখানেই অবস্থান করল। ভোরে অতর্কিত শত্রুদল এসে তাদের উপর আপতিত হল এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিল। এই হল উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করল এবং আমার আনীত বস্তু (কুরআন ও হাদীস) এর অনুসরণ করল আর যারা আমার অবাধ্যতা করল ও আমার আনীত হক্ককে মিথ্যা জ্ঞান করল (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭২৮০)।

---

২৪ পাতার পর —

সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ঐ আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, তিনি সত্য রসূল, তিনি হক নিয়েই এসেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের (কাউকেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলেন না; বরং) বের করে দিলেন (বুখারী ৩৯১১)।

বলপূর্বক মুসলিম বানানো ইসলামে আইন বিরুদ্ধ কাজ। মুসলিমরা চাইলেও কাউকে জোর করে মুসলিম বানাতে পারে না। সুতরাং আনসার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যখন নিজেদের সেইসব সন্তানদের জবরদস্তি মুসলিম বানানোর পরিকল্পনা করেন যাদেরকে ইয়াহুদী বানানো হয়েছিল নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মদীনায় আসার আগে, তখন আল্লাহ্ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন —

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২৫৬, তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৬৮২, তাফসীর ত্বাবারী ৫/৪০৭)। অতএব তরবারীর মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি মুসলিম বানানো হয়েছে — একথা সর্বৈব মিথ্যা।

দাওআত ও সংগঠন

আইনুল হক

সর্বোত্তম ও সর্বাধিক জরুরী পরিষেবা ঃ মানুষ হিসাবে আমরা একে অন্যের প্রতি বিভিন্নভাবে দায়িত্বশীল। এই পৃথিবীতে আমরা প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে নানান পরিষেবা প্রদান করে থাকি। তন্মধ্যে সর্বোন্নত ও সবচেয়ে জরুরী পরিষেবা হল মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান। দূরাগত কোনো মানুষকে অন্ন, বস্ত্র ও নিরাপদ আশ্রয় সহ সব পরিষেবা দেওয়ার পরও যদি তাকে বাড়ি ফেরার রাস্তা না দেখিয়ে দেওয়া হয় অথবা এমন এক রাস্তা দেখানো হয় যা তাকে নিশ্চিত বিপদসঙ্কুল কোনো স্থানে পৌঁছে দেয় তাহলে তা হবে চরম অমানবিকতা তথা চূড়ান্ত অবিচার। আমরা মানুষ। আমাদের আদি পিতা আদম (আলাইহিস্ সালাম) জান্নাত থেকে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ জান্নাতের অভিমুখী। কিন্তু মানুষের চিরশত্রু ইবলিস নিরন্তর বাধা প্রদান করতে থাকে। ইবলিস মানুষকে ভুলিয়ে দেয় তার সৃষ্টির মূল রহস্য। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদাতের জন্য — একথা ভুলে গিয়ে মানুষ তার অভিমুখ পরিবর্তন করে ফেলে। মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে সেই পথ ভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথ নির্দেশের জন্য প্রেরণ করেছেন নাবী ও রসূলগণকে। তাঁদের মৌলিক কর্মসূচী ছিল সমস্ত শয়তানী প্রতারণা থেকে মুক্ত করা এবং মহান স্রষ্টার একনিষ্ঠ ইবাদাতের মাধ্যমে জান্নাতগামী পথের দিকে আহ্বান। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম — তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?'' (৪/৩৩)

তিনি আরও বলেন, ''বলুন, এটাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি। আর আল্লাহ্ মহা পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের মধ্যে নই'' (১২/১০৮)

যুগে যুগে মানুষ এই পরিষেবা পেয়ে এসেছে নাবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে। শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তাঁর উম্মতের উপর। তাই আজও আমাদের কাছে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক জরুরী পরিষেবা

'দাওয়াহ ইলাল্লাহ্' — আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান। সেই সাথে এও মনে রাখা দরকার চূড়ান্ত ধ্বংসের সমূহ সর্বনাশ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপ হল দাওয়াত ইলাল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান। পবিত্র কুরআনের ১০৩ নং সূরা আসরের আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারি যে ঈমান এবং সৎকর্ম সম্পাদনের পর একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল চূড়ান্ত সত্য তথা হকের প্রতি নিরন্তর আহ্বান এবং সে পথে অবিচল থাকার নিরন্তর প্রয়াস।

সংগঠন ঃ আলোচ্য দাওয়াতী কর্মসূচী সুসম্পন্ন করার জন্য উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল সংগঠন। আসলে সৃষ্টির একটা সহজাত বৈশিষ্ট্যই হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। যেকোনো ভালো কাজ সুসম্পন্ন করতে একে অপরের সংযোগিতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহ্‌র বিধানকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন (৩/১০৩)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্পষ্ট ঘোষণা — ''জামাআত হল রহমত স্বরূপ আর বিচ্ছিন্নতা হল আযাব'' (সিলসিলাহ্ সহীহা আলবানী ৬৬৭)। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার কিছু মানুষ একত্রিত হওয়ার নামই জামাআত বা সংগঠন নয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'হকের অনুগামীতাই হল জামাআত, যদি ও তুমি একাকী হও' (আর সীফ মুলতাকা আহলিল হাদীস)।

অতএব সংখ্যা যাই হোক না কেন হক পালনের উদ্দেশ্যে, হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং হকের প্রতি আহ্বানের জন্য উদ্যোগী জনসমষ্টিই হল জামাআত।

ওরা পারে, আমরা পারিনা? নিজেকে এবং নিজের জাতিকে বাঁচাতে সাংগঠনিক চেতনা শুধু মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র কুরআনে দু'দুটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে দুটি সাংগঠনিক প্রাণীর নামে। একটি হল সূরা নাহ্‌ল (মৌমাছি), অপরিট সূরা নামাল (পিপীলিকা)।

মহান আল্লাহ্ মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন পাহাড়ে, গাছে ও লোকালয়ে বাসা বাঁধতে এবং বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে। যদি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মৌমাছিরা একা একা পালন করতো তবে মৌচাক ভর্তি মধু আমরা পেতাম কি? অজস্র মৌমাছি একসঙ্গে, সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে চলেছে (সূরা নাহ্‌ল ৬৮-৬৯)। সেই ছোট্ট একটা প্রাণী পিপীলিকার কথা কি আমাদের মনে পড়ে? নাবী সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর সুবিশাল বাহিনী দেখে একটা পিঁপড়ে ছুটে গেছে তার প্রজাতির কাছে। সুলাইমান (আঃ) এর বাহিনী দ্বারা পিষ্ট হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় পিঁপড়েটি তার সঙ্গীদের আহ্বান জানিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করার জন্য। নিজের কওমকে বাঁচানোর জন্য কী আশ্চর্য দায়বদ্ধতা পালন করেছে ছোট্ট একটা পিঁপড়ে (সূরা নামাল ১৮)।

আমরা মানুষ! সৃষ্টির সেরা। যে কাজ পিঁপড়ে পারে, মৌমাছি পারে, সে কাজ আমরা পারি না?

পথে নেমে যেও না থেমে ঃ পথের দাবী হল চলমানতা। পথে নেমে থেমে গেলে চলবে না। দাওয়াতী কাজে সফলতার একটা গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা। আজ করলাম, একদিন করলাম তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম — এভাবে হতে পারে না। পৃথিবীর প্রথম রসূল নূহ (আলাইহিস্ সালালম) নিজের দাওয়াতী কাজ সম্বন্ধে ঘোষণা দিয়েছেন, 'আমি রাতদিন আমার জাতিকে আহ্বান করেছি'। কিন্তু অবিরাম একা একা পথ হাঁটা বড় কষ্টকর, ক্লান্তিকর। প্রয়োজন যোগ্য সঙ্গীর, হকপন্থী সংগঠনের। গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাওয়াতী কাজকে গতিশীল রাখতে সফল কর্মীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর একমাত্র একটি আদর্শ সংগঠনই গড়ে তুলতে পারে একদল ন্যায় নিষ্ঠ সফলকর্মী।

যাদুগর নয়, এ কাজ কারিগরের ঃ যাদুগর মানুষের সামনে যা উপস্থাপন করে তা হল ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল তথা ভেল্‌কি। ও কাজের জন্য খুব বেশি উপাদান উপকরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কারিগর যা করে তা হল সত্যিকারের কাজ। তার জন্য প্রয়োজন অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান , উপকরণ ও সময়। যাদুগর যা করে তা মুহূর্তের মধ্যেই করে এবং সামনের দর্শকমণ্ডলীর মধ্য থেকে যাকে তাকে একজনকে ডেকে নিয়েই ভেল্‌কি দেখায়। কিন্তু কারিগরের প্রয়োজন দীর্ঘ সময় আর একাধিক দক্ষ, প্রশিক্ষিত সঙ্গী সাথী। আর এ সমস্ত উপাদানগুলো সংগঠন ছাড়া পাওয়া যায় না।

বোধের বিভ্রান্তি থেকেই বিরোধের সূত্রপাত ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর প্রকৃত পরিচয়, রসূল এবং তাঁদের প্রকৃত অবস্থান, আসমানী কিতাবসমূহ, মালায়েকাহ্ — এসব সম্পর্কিত নানা বিষয়ের সঠিক বোধ ও প্রত্যয় তথা বিশুদ্ধ আক্বীদার অভাবই সমাজে বিভ্রান্তির মূল কারণ। দাওআতের একটি মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই

বিভ্রান্তি ও বিভক্তি নিরসন করা তথা বিশুদ্ধ আক্বীদা জনসমাজে প্রচার করা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই বিভ্রান্তি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর মূলোৎপাটন একা নয় অনেকে মিলেই সম্ভব। বারবার উচ্চারণের ফলে মানুষের কাছে মিথ্যা সত্য বলে মনে হয়। আবার নীরবতার কারণে সত্য কখনো কখনো জনসমাজে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। তাই নীরবতা নয়, নির্ভীক জোরালো কণ্ঠে সমাজের সর্বস্তরে উচ্চারিত হতে হবে প্রকৃত সত্য, বিশুদ্ধ আক্বীদার বার্তা। আর একাজ সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব।

এসো হে পথিক পান্থশালায় ঃ দাওয়াতী কর্মে নাবী ও রাসূলগণের নিত্যসঙ্গী ছিল বাধা আর প্রতিকূলতা। সেই বাধা কখনো কখনো সম্মুখে পাহাড়ের মত এসে দাঁড়িয়েছে। বাধা আর বাধা। এ ধারাবাহিকতার আজও বিরাম নেই। এ বাধা এসেছে বিভিন ক্ষেত্র থেকে। শিরকের ধ্বজাধারি, বিদ্আতের কারবারি, ভ্রষ্টতার ব্যাপারী, মনুষ্যত্ব বধকারী শিকারী, ধর্মান্ধতার অনুসারী আর সর্বোপরি কায়েমী স্বার্থের লোভে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য মরিয়া ধর্মব্যবসায়ীর দল — এ সবের যেকোন স্তর থেকে বাধা আসতে পারে যে কোনো সময়। এ সমস্ত বাধার নিরন্তর মেকাবিলা করতে হয় দাওয়াতী কর্মীদের। কখনো আঘাতে, প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে তাদের নিবিড় আশ্রয় হয়ে ওঠে একটি আদর্শ সংগঠন। আহত পাখির মত, ঝড়-ঝঞ্ঝা কবলিত পথিকের ন্যায় সংগঠনের নিবিড় আশ্রয়ে তারা নিরাপত্তা খুঁজে পায়।

হাত বাড়াই, পাশে দাঁড়াই ঃ ন্যায়নিষ্ঠ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সংগঠন জেগে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসীবান্দাদের নির্দেশ দেন, 'তোমরা সৎকাজে ও আল্লাহ্ভীরুতায় একে অন্যকে সাহায্য কর' (৫/২)। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর সত্যনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকো' (৯/১১৯)।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বহু অনুপম দৃষ্টান্তবলী উপস্থাপন করেছেন।

একটি পাখি উড়তে উড়তে দেখেছিল এই ভূখণ্ডের কোনো এক জনপদে শির্কের ভয়বহতা। নাবী সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এর কাছে সে প্রকাশ করল। অতঃপর নাবীর নির্দেশে সেই পাখি তাওহীদের লিখিত বার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সাবার রাণী বিলকিসের কাছে। হুদহুদ নামের সেই পাখির ডানায় ভর করে দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল (২৭/২৩-৩৩)।

সেই কুকুরটির কথা কি আমরা কখনো ভুলতে পারবো? স্মরণে রাখার জন্যই তো আল্লাহ্ সেকথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। হকপন্থী, তাওহীদবাদী একদল যুবক অত্যাচারিত হবার ভয়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সঙ্গী হল একটি কুকুর। নিরাপত্তার জন্য যখন তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল তখন কুকুরটি নিরাপত্তা রক্ষীর অতন্দ্র প্রহরায় সেই গুহার দ্বারে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বসে রইল তিনশত নয় বছর (১৮/১০-১৩, ১৮)।

একটি পশু পারল, একটি পাখি পারল আর আমরা পারব না? আসুন ন্যায়নিষ্ঠ, হকপন্থী সংগঠনকে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়াই, তাদের পাশে এসে দাঁড়াই।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নেই ওরে ভয় নেই" ঃ আমরা তো কাজ করব আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, যিনি মহান, মহা পরাক্রমশালী, মহান শক্তিধর। তাই ভয় নেই, ভয়ের কোনও কারণও নেই। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক, সমস্যা যত গভীরই হোক — একজন মুমিন কখনো দাওয়াতী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না এবং হকপন্থী মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নও থাকতে পারে না।

একটি উপমা দিয়ে এ আলোচনার ইতি টানবো।

কোনো এক গভীর খাদের কিনারা বেয়ে প্রসারিত একটি সরু, নরম ডালে একটি পাখি বসে আছে। খাদের গভীরতায় সে ভয় পাচ্ছে না। ডাল ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে সে কম্পিত নয় কারণ তার ভরসা ডালের উপর নয়, তার ভরসা ডানার উপর। সে জানে 'যতক্ষণ ডাল আছে এখানে থাকব, ডাল ভেঙ্গে পড়লে অন্যত্র উড়ে যাব' পরিস্থিতি যতই ভয়ংকর হোক, সমস্যা যত গভীর হোক, একজন ন্যায়নিষ্ঠ সংগঠক, একজন আদর্শ মুমিন কখনো দাওয়াতের কাজে বিরত থাকতে পারে না। কারণ তাঁর ভরসা তো কেবল আল্লাহ্র উপর, আর তার দুটি ডানা পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ — এর উপর ভর করে সে বিচরণ করতে পারে মানবতার বিস্তীর্ণ আকাশে।

আল্লাহ্ আমাদের সম্মিলিতভাবে সাংগঠনিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠ কাজ করার তাওফীক দিন — আমীন।

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মুখতার হুসাইন (রাহিমী)

ان الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده ! اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

بسم الله الرحمن الرحيم

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ o خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍo اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ o الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ o عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ o

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র প্রচারে এবং মানবতার বাণী পৌঁছে দিতে জমঈয়তে আহলে হাদীস পশ্চিম বাংলার উদ্যোগে, সরল পথ অ্যাকাডেমি সংলগ্ন মাঠে দুই দিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন ২০১৮ এর আজ দ্বিতীয় দিন (৩রা মার্চ ২০১৮)।

সম্মেলনের সভাপতি ঃ শায়খ শাইদুর রহমান মাদানী সাহেব, সভাপতি — জমঈয়তে আহলে হাদীস পশ্চিমবাংলা।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ঃ শায়খ সালাহুদ্দীন মাক্কবুল আহমাদ, মাদানী, হাফিযাহুল্লাহ্। বিশেষ অতিথি, শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদগণ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধি এবং সুধী শ্রোতামণ্ডলী। সকলকে আমার আন্তরিক সালাম ও মুবারাকবাদ জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষা হল মহান আল্লাহ্র এক বিশাল নিয়ামত। এটা হল মানুষের সার্বিক বিকাশ তথা all round development এর মানদণ্ড, সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি, জাতীয় জীবনের আলোক-বর্তিকা। মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আদর্শ নিয়ন্ত্রক হল শিক্ষা, জন্মসূত্রে সৃষ্ট মানুষকে 'সত্যকার মানুষে' রূপান্তরিত করার পরশমণি হল শিক্ষা, সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান অসংখ্য জীব ও জড় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়েছে মানুষ এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার সুযোগ্য খলিফা তথা প্রতিনিধি হবার সুযোগ লাভ করেছে এই শিক্ষার বদৌলতে। এটা মহান আল্লাহ্র বিশাল অনুগ্রহ যে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সীমাহীন ও অসংখ্য অজ্ঞাত .. বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে এনেছেন। এটা একমাত্র ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

সমগ্র পৃথিবী যখন শির্ক ও অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন মহান আল্লাহ্ সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নবুওয়াতের সূচনা করলেন — আল্ কুরআনের এমন পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে, যে আয়াতের মধ্যে দুবার পড়া, একবার কলম দ্বারা শিক্ষা এবং একবার শুধু শিক্ষার কথা রয়েছে —

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ o خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍo اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ o الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ o عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ o

তুমি পড় তোমার পালনকর্তার নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, তুমি পড় তোমার পালনকর্তা সব চেয়ে সম্মানিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না (সূরা আলাক, ৯৬/১-৫)।

কুরআন মাজীদের মধ্যে শিক্ষা বিষয় কমবেশী ৮৫০ বার বর্ণিত হয়েছে। গোটা কুরআনটাই যেন শিক্ষার পরিপূর্ণ এক বিশাল লাইব্রেরী। এই কুরআনের শিক্ষা একমাত্র মানব জীবনের কল্যাণের পাথেয়, সেটাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা। মহান আল্লাহ্ বলেন —

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

আলিফ-লা-ম-র! এটি এমন একটি গ্রন্থ যাকে আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে সর্বপ্রকারের অন্ধকার থেকে প্রকৃত আলোর দিকে বের করে আনতে পার সর্বজয়ী প্রশংসিত আল্লাহ্র পথে।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন —

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

তিনি (মহান আল্লাহ্) তার বান্দা (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য।

তৎকালীন বিশ্ববাসী প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে অজ্ঞতা ও মূর্খতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে অশান্তির দাবানলে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করলেন আল কুরআনুল মাজীদ।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তৎকালীন অশান্তি প্রিয় বরাবর অশিক্ষিত মানুষকে অন্ধকারময় অশান্তির দাবানল থেকে উদ্ধার করার জন্য জীবনের অতিমূল্যবান সময়— দীর্ঘ ২৩টি বছর ব্যয় করলেন। তিনি শিক্ষার মূল উপাদান কুরআন ও প্রজ্ঞা তথা - হাদীসকেই শিক্ষার পাঠ্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থঃ তিনিই সেইজন যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের কাছে তাঁরই আয়াতগুলি পড়ে শোনান এবং জীবন পরিশুদ্ধ পবিত্র করেন ও তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। যদিও এর আগে তারা তো ছিল স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে (সূরাহ্ জুমুআহ্ ৬২/২)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কুরআন মাজীদ এবং কুরআনের ভাষ্য হিসাবে 'হিকমাহ্' তথা অহীয়ে গাইর মাত্লু (হাদীস) এর শিক্ষা দান শুরু করলেন। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ছিল মাত্র দুটি পুস্তক, মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন এবং হাদীস। এটাই ছিল প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার মেরুদণ্ড। এই শিক্ষার ফলে নাস্তিকরা হয়ে গেল মুমিন, মুশরিকরা হয়ে গেল তাওহীদবাহী, লুটেরা-ছিনতায়ীরা হয়ে গেল মানুষের সম্পদের প্রহরী, খুনী ও অপহরণকারীরা হয়ে গেল নিরাপত্তার চৌকিদার। নারীর সতীত্বের জমেরা হয়ে গেল নারীর সতীত্বের পাহারাদার। যারা ছিল সন্ত্রাসী তারা হয়ে গেল শান্তিপ্রিয়-শান্তির ঝাণ্ডাবাহী। গড়ে উঠল এক নতুন দিগন্ত ও শান্তিময় পৃথিবী।

দেশ ও সমাজের সামগ্রীক মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণে আমাদের বর্তমান অবস্থা - জাহেলিয়াত থেকে পার্থক্য কোথায়? অন্যায়-অবিচার সমাজে চরমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ন্যায়-নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। আজ শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দিশেহারা। শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষাঙ্গণে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। শিক্ষার নামে শিক্ষার পাশাপাশি চলছে কুশিক্ষার পাঠদান। সংস্কৃতির নামে বেড়ে চলেছে অপসংস্কৃতি। আধুনিকতার নামে নগ্নতার প্রকোপে লজ্জাবোধ যেন চির মৃত্যু বরণ করেছে। মানবতা যেন প্রাচীন জাহেলী ও বরবর নগ্ন সভ্যতায় ফিরে গেছে। জুয়া, মাদকতা, ঘুষ, মিথ্যা, আত্মসাত, প্রতারণা এবং যাবতীয় নোংরামী সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জাঁকিয়ে বসেছে। নারী অধিকারের মেকী প্রবক্তারা নারীর ইজ্জতটুকু রক্ষা করতে ব্যর্থ। তাই দৈনিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিদিনই শিরনামে থাকছে 'ধর্ষণ' ও 'পণেরবলী', 'পণের দায়ে আত্মহত্যা'। ব্যাভিচার, জুলুম-অত্যাচারের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে হাজার হাজার নিষ্পাপ ও নিরাপরাধ মানুষের রক্ত নিয়ে এখন হোলি খেলা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা নির্বিচারে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেই চলেছে। আবার সন্ত্রাস দমনের নামে নির্দোষ মুসলিম শিক্ষিত যুবকদের জেলে পুরে উদীয়মান তরুণ-তাজা ঈমানী প্রাণগুলিকে পচিয়ে দিচ্ছে। শাসনের নামে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের নিধন মহামারী অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিপন্ন আজ মানবতা। হায়নার দলেরা মানবতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

অন্যদিকে মুসলিম সমাজ শিরক ও বিদ্আতের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জাল-যঈফ হাদীসের বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলিম মিল্লাত আজ টুকরো টুকরো হয়ে কঙ্কাল আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বর্তমান সমাজের এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বীনি শিক্ষা ও দাওয়াত প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারযে আইন। আল্লামাহ্ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায্ (রহঃ) বলেন —

عند كثرة المنكرات و عند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته.

মমার্থ ঃ বর্তমান যুগে যেভাবে মুনকারাত চরমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং অজ্ঞতা বিজয় লাভ করেছে, এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের উপর সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াত প্রদান করা ফারযে আইন।

الدعوة الى الله و ما ينبغى أن يتجلى به الدعاة، الكويت الدار السلفية.

দাওয়াত প্রদান যেমন ফারযে আইন, তেমনি ইসলামী শিক্ষাও ফারয। দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন —

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ.

অর্থ ঃ বল হে মুহাম্মাদ! এটিই আমার পথ। স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীরা আহ্বান করি (সূরাহ্ ইউসূফ ১২/১০৮)।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

অর্থ ঃ তুমি মানুষকে হিকমাহ্ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬/১২৫)

'হিকমাত' এর অর্থ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে (তাফসীর ইবনে কাসীর ৫৭৫)।

ইসলামী শিক্ষা-নাস্তিকতার অন্ধকার দূরীভূত করে তাওহীদের পথ প্রদর্শন করে। অবাধ্যতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে একমাত্র তিনি ছাড়া আর তো কোনো ইলাহ্ নেই। আর ফেরেশতারা এবং ন্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের অধিকারীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন (সূরা আল্ ইমরান ৩/১৮)।

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্কে চেনা যায়। প্রকৃত আলেমই মহান আল্লাহ্কে ভয় করে। মহান আল্লাহ বলেন —

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

অর্থ ঃ আল্লাহ্র বান্দার মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে (সূরাহ্ ফাত্বির ৩৫/২৮)।

এই জ্ঞানী বলতে কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং আল্লাহ্ সম্পর্কীয় নানা রহস্যের জ্ঞানী। বলা বাহুল্য তাঁরা যত আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন; ততই আল্লাহ্কে ভয় করেন। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ্ ভীতি নেই, সে সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। সুফয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আলেম তিন প্রকার — (১) আলেম বিল্লাহ্ অ আলেম বি আমরিল্লাহ। এই প্রকার আলেম হলেন তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করেন এবং তাঁর হদূদ ও ফারায়েযের জ্ঞান রাখেন। (২) আলেম বিল্লাহ্, এঁরা আল্লাহ্কে ভয় তো করেন, কিন্তু তাঁর হদূদ ও ফারায়েয সম্পর্কে অবগত নন। (৩) আলেম বি আমরিল্লাহ্, এরা আল্লাহ্র হদূদ ও ফারায়েয সম্পর্কে তো অবগত কিন্তু আল্লাহ্ ভীতি থেকে বঞ্চিত (ইবনু কাসীর, আহ্সানুল বায়ান)।

ইসলামী শিক্ষাই হল অধিক মর্যাদা লাভ ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। মহান আল্লাহ্ বলেন —

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন (সূরাহ্ আল মুজাদিলাহ্ ৫৮/১১)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিখায় (সহীহ্ বুখারী হাঃ নং ৫০২৭, ৫০২৮, আবূ দাউদ ১৪৫২)।

ইহলোকে ও পরলোকে প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের চাবিকাঠি একমাত্র ইসলামী শিক্ষা। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭, ৩১১৬; সহীহ্ মুসলিম ১০৩৭)।

ইসলামী শিক্ষার প্রকারভেদ ঃ

১। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য যে শিক্ষা অর্জন করা ফরয। যথা - ঈমান-আক্বীদাহ্ আমল-ইবাদাত সঠিক হওয়ার জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন। ইমাম বুখারী (রহ) সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় ইল্ম পর্বের মধ্যে ১০ নং অধ্যায় রচনা করেন — باب العلم قبل القول و العمل বলা ও করার পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক। তারপর তিনি সূরাহ্ মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াত উল্লেখ করেন — فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ্ নেই। মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, এই বিশ্বাসের উপর অটল থাকতেই হবে, নচেৎ আমলের কোনো মূল্য থাকবে না। তাওহীদ-শিরক্, আক্বীদাহ্ তথা আল্লাহ্র গুণাবলী, রসূল, ফারিশতা, কবর, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে ঈমান ও আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমলের ক্ষেত্রে ফরয আমলের ত্বারীকা ও পদ্ধতি জানাও ফরয। যথা — স্বলাত, স্বিয়াম, হজ্জ, যাকাত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

(২) দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে মাসায়েল নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করা এবং হাদীসের যাঁচাই বাছাই করে সঠিকটি নির্ণয় করা, ফারযে কিফাইয়াহ্, কিছু লোক এই বিদ্যা অর্জন করলে অন্যের উপর আর ফরয্ থাকবে না (ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়েমাহ্ ১২/৯০-৯১)।

(৩) দ্বীনের ফরয বিদ্যা অর্জনের পর কতিপয় বিদ্যা যেগুলি পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। সেগুলিও অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু যেগুলি ফারযে কিফাইয়াহ্ যথা — ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কারীগরি, কৃষিবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই বিদ্যাগুলি অর্জনে যদি নিয়্যাত পরিস্কার থাকে যে আমি জাতির সেবা ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্জন করছি, তাহলে দ্বীনী শিক্ষার মধ্যে গন্য হবে (ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্ ১২/৭৭)।

এক শ্রেণির মুসলিমরা শুধু পার্থিব জগতের মনোরম ও উপভোগ্য বস্তু অর্জনের জন্য উল্লেখিত পেশাদারী বিদ্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে, আখেরাত বলে চিন্তাই থাকে না। যারা পেশাদারী দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করবে তাদেরকে পালনকর্তার নাম সংক্রান্ত বিদ্যার কথা ভুললে মোটই চলবে না, অন্যথায় তারা বিরাট বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক হয়েও দ্বীনী জ্ঞানের অভাবে চিন্তা ও কর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে। তাই তাদের চলনসই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যিক।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যাঁরা ইসলামী শিক্ষা কিংবা কুরআনের শিক্ষার কথাকে মনে করেন এটা মাসজিদ মক্তবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের উদ্দেশ্যে আমার কয়েকটি কথা —

১। মানবাধিকার ও মানবিক সংহতির শিক্ষা ইসলামই দিয়েছে (সূরা হুজরাত ৪৯/১৩)।

২। মানব কল্যাণের শিক্ষা ইসলামই দিয়েছে (সূরা আল্ ইমরান ৩/১১০)।

৩। মানুষকে তুচ্ছ না ভাবার শিক্ষা ইসলামই দিয়েছে (সূরা লুকমান ৩১/১৮)।

৪। পরধর্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা ইসলামেই রয়েছে (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২৫৬, সূরা কাসাস ২৮/৫৫, আনআম ৬/১০৮, কাফেরুন ১০৯/১)।

৫। অমুসলিমের সাথে উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা ইসলামেরই শিক্ষা (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৫৯৮, সহীহ মুসলিম ২০৬৮)।

৬। অসহায় ইয়াতিমদের লালন পালনের শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬০০৫, ৫৩০৪)।

৭। বিপন্ন মানুষের সাহায্যে শিক্ষা (সহীহ্ বুখারী ৬০২২, মুসলিম ১০০৮)।

৮। অধিকার আদায়ের জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যাবে না। ইসলামের শিক্ষা (সহীহ্ মুসলিম ১৮৬৪, তিরমিযী ২১৯৯)।

৯। মানুষ হত্যা মহাপাপ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৩২, সহীহ্ বুখারী ৩৩৩৫, ৬৮৬৭, ৬৫৩৩, ৬৮৬৪)।

১০। শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা (সূরা তাওবাহ ৯/৬, সহীহ্ বুখারী ৭৩৭৬, তিরমিযী ২২৬৩, আবূ দাউদ ৪৯৪১)।

১১। সন্ত্রাস নির্মূলের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/২৪, বাক্বারাহ্ ২/১১, ৬০,২০৫)।

১২। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা (সহীহ্ বুখারী ৬০১৬)।

১৩। সৃষ্টি সেবা ইসলামী শিক্ষা (সহীহ্ বুখারী ২৩২০, ৬০১২)।

১৪। শালিনতার শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা (আবূ দাউদ ৪৭৯১)।

১৫। ভদ্রতার শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা (আবূ দাউদ ৪৭৯০)।

১৬। মানুষের কৃতজ্ঞতার শিক্ষা হাদীসের শিক্ষা (আবূ দাউদ ৪৮১১, তিরমিযী ১৯৫৪)।

১৭। ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতার শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা (সূরা দাহার ৭৬/৩)।

১৮। ধর্মীয় শিক্ষাকে পেশা না বানানোর শিক্ষা হাদীসের শিক্ষা (আবূ দাউদ হাঃ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ্ ২৫২)।

১৯। মাতৃভাষার শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা (সূরাহ্ ইব্রাহীম ১৪/৪)।

২০। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা কুরআনের আয়াতে স্বীকৃত (সূরাহ্ রুম ৩০/২২)।

২১। ইতিহাসের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা (সূরাহ্ আ'রাফ ৭/১৭৬)।

২২। গণিতের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষা (সূরাহ্ নিসা ৪/১১)।

২৩। বিজ্ঞানের শিক্ষা কুরআনেই প্রমাণিত (সূরাহ্ ইমরান ৩/১৯০)।

২৪। ডাক্তারী শিক্ষা হাদীসে স্বীকৃত (সহীহ্ বুখারী ৫৬৭৮, মুসলিম ২২০৪)।

একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়াত সম্বন্ধে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পরে যে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য যথা সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব, গণিত, দর্শন, বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে বর্দ্ধিত জ্ঞান আহরণ করার অনুমতি ইসলামে দেওয়া হয়েছে।

হে আল্লাহ্! মুসলিম জাতিকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার তাওফীক দান কর — আমীন।

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের বিশুদ্ধ বই-এর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান —

সরল পথ পাবলিকেশন

উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদ (দ্বিতল)

পোঃ - ঘোড়শালা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

পিন - ৭৪২২৩৪, Mob : 8926787893 , 9800534243

তালাক ও তাহলীল

তাজাম্মুল হক সালাফী

দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও প্রিয়জনদের সুপরামর্শের ভিত্তিতে দুটি পরিবার নিজ নিজ পুত্র ও কন্যাকে একে অপরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। জায়া ও পতি পায় ইসলামিক ও সামাজিক স্বীকৃতি। তারা নিজেদের মত করে ইসলামী বিধান মেনে সুখের সংসারে নিমগ্ন হয়। বসবাসের মেয়াদ যতই বৃদ্ধি পায়, ততই একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায় এবং মায়া মুহব্বতও পুরাতন ও পোক্ত হয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই উভয়ের নিকটে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও সর্বাধিক পরিষেবা পেতে চায়। ঈমানদার স্বামী তার স্ত্রীর সর্বাধিক কল্যাণার্থে ইসলামী আদব কায়দার বাস্তবায়ণ চায়। ফলে আশানুরূপ পরিষেবা, ভালোবাসা ও ইসলামি বিধানের বাস্তবায়ন না পেলে স্বামী খুব কষ্ট পায়। ধীরে ধীরে এক সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মনমালিন্যও দেখা দেয়। উভয়েই বিচ্ছিন্নতাতেই সুখানুভব করে। তখন তাদের জন্য বিচ্ছিন্নতাতেই মঙ্গল নিহিতও থাকে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ পদ্ধতিই ইসলামে তালাক ও খোলা নামে পরিচিত।

স্বামী বা স্ত্রী প্রত্যেককেই ইসলাম দিয়েছে স্বাধীনতা। স্বামী চাইলে যেমন প্রয়োজনে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে তেমনি স্ত্রীও খোলা নিয়ে বা বিবাহ ফাসখের মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। এর ফলে স্বামী বা স্ত্রী কাউকে আত্মহত্যার মত কলঙ্কময় পথ বেছে নিতে হয় না। আবার বিধবা বিবাহ বা পূর্নবিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই জন্য নতুনভাবে সংসার পাতানোর সুযোগও রয়েছে ইসলামে। সুতরাং তালাক ও খোলা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। মানবতার কল্যাণও এতেই নিহিত রয়েছে। অসংখ্য নারী ও পুরুষ তালাক ও খোলা নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে আছেন। যদি তালাক, খোলা বা বিধবা বিবাহের সুব্যবস্থা না থাকত, তাহলে যেমন বহু নারীকেই সধবা হয়েও বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করতে হত বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে হত বা যৌনসুখ ভোগের জন্য ব্যাভিচারকেই একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিতে হত, তেমনি একজন পুরুষকেও উপপত্নির উপর নির্ভর করেই যৌনক্ষুধা নিবারণ করতে হত। যা সুশীল সমাজের জন্য লজ্জা ও কলঙ্ক।

তালাক দেওয়ার পূর্বে সংশোধনের পদ্ধতি ঃ

আপসে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা ঃ স্ত্রীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে বা ছোট ছোট কারণে রাগান্বিত হয়ে বা শরীআতের কোনো বিধান পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন ইসলাম প্রেমী স্বামীর কাজ নয়। বরং আলাপ আলোচনা ও সলাহ পরামর্শ করার মাধ্যমে সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রাত্যহিক কোনো বিষয়ে বা শরীআতের কোনো বিষয়ে মনমালিন্য হলে নিজেরাই আপসে সমাধানের উপায় বের করবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই রাগ প্রশমিত করে সমাধান করে নিতে হবে বা প্রয়োজনে উভয় পরিবারের, আত্মীয় পরিজন বা প্রিয়জনদের নিয়ে বসেও সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করা ঃ আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান না হলে হালকা শাস্তি হিসাবে স্বামী প্রয়োজনে স্ত্রীর বিছানা পৃথক করে দেবে। বুদ্ধিমতি ও সরলমনা স্ত্রীরা স্বামীর রাগ ও ক্ষোভ অনুভব করতে পারে, নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের সংশোধন করে স্বামীর নিকটে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং স্বামীর নিকটেই আত্মসমর্পণ করে।

ইলা ঃ এতেও সমাধান না হলে স্বামী 'ইলা' করতে পারে। 'ইলা' হল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত প্রকার দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর সর্বোচ্চ মিয়াদ হল চার মাস (২/২২৬-২২৭)। মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর হয় তালাক দিতে হবে না হয় ইলা ভঙ্গ করে একসঙ্গে বসবাস শুরু করতে হবে। অবশ্য চার মাসের থেকে কমও সময়ের জন্য ইলা করা যাবে যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এক মাসের জন্য 'ইলা' করেছিলেন (বুখারী কিতাবুন নেকাহ্, বাবু হিজরাতিন নাবীয়ে সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)। যদি তাতেও সমাধান না হয়, তখন তালাকের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং তালাকের বিধান মেনেই তা কার্যকর করতে হবে।

তালাক ঃ

তালাকের অর্থ কী ঃ 'তালাক' শব্দের অর্থ হল বন্ধন খুলে দেওয়া। শরীআতের পরিভাষায় তালাক হল বিবাহের বন্ধনকে খুলে দেওয়া (ফিকহুল হাদীস)।

তালাক দেওয়ার শারয়ী মান ঃ (ক) তালাক দেওয়া হারাম যদি তালাকে বিদয়ী হয়, (খ) মাকরূহ যখন কোনো কারণ ছাড়াই সুস্থ পরিবেশে তালাক দেওয়া হয়, (গ) ওয়াজেব যখন উভয় পক্ষের ফায়সালাকারীরা দুজনকে পৃথক করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করবে, (ঘ) মুস্তাহাব যদি স্ত্রী পবিত্রা ও সচ্চিত্রবান না হয় এবং জোর করেও শারয়ী বিধান পালন না করে এবং (ঙ) জায়েজ যখন স্বামী স্ত্রীর মন্দ চরিত্র অথবা অন্য কোনো কারণে অপছন্দ করে (বিস্তারিত জানতে দেখুন ফিকহুল হাদীস)।

পিতা-মাতার নির্দেশে তালাক ঃ পিতা মাতা শারয়ী কারণ বর্ণনা করে তালাক দিতে বললে তালাক দেওয়া জরুরী। যেমন স্ত্রীর চরিত্র ভালো নয়, পরপুরুষের সঙ্গে মেশামেশি করে ইত্যাদি কারণে পিতামাতা তালাক দিতে বললে তালাক দেওয়া জরুরী। আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ''তার একটি স্ত্রী ছিল, তাকে আমি খুব ভালোবাসাতাম কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করত। তাই আমাকে তালাক দিতে বললে, আমি তা অস্বীকার করি। অতঃপর আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বিষয়টি জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, তাল্লিক ইমরাআতাকা অর্থাৎ তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও (তিরমিযী বাবু মা জাআ ফীর রাজুলে ইয়াসআলুহু আবুহু আই ইয়োতাল্লাকা যাওজাতাহু, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

আর যদি শরীআতের কারণ ছাড়া কেবল ছেলে বউমাকে খুব বেশি ভালোবাসে বা হিংসার বশবর্তী হয়ে তালাক দিতে বলে তাহলে তালাক দেওয়া জরুরী নয়, বিশেষ করে স্ত্রী যখন দ্বীনদার হবে।

তালাক কখন দিতে হবে ঃ স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় বা ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে এমন হয়, তাহলে যে কোনো সময়ই তালাক দেওয়া যায় আর যদি স্ত্রী ঋতুবতী হয়, তাহলে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর, তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করে তালাক দিতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যখন তোমরা মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করে তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেবে'' (সূরা বাক্বারাহ্ ২৩৬)।

তালাকের প্রকারভেদ ঃ তালাক দুই প্রকার ঃ (ক) তালাকে সুন্নী এবং (খ) তালাকে বিদ-ঈ।

তালাকের সুন্নীর জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য ঃ (১) হায়েযের অবস্থায় যেন তালাক না দেওয়া হয়। যেমন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হায়েযের অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন বলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন (বুখারী ৪৯০৮, মুসলিম ১৪৭১)। (২) নেফাসের অবস্থায় যেন তালাক না দেওয়া হয় কেননা নেফাস পবিত্র নয়

আর হাদীসে রয়েছে যেন পবিত্র অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়। যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র জন্য বলেছিলেন, ''তাকে রুজু বা ফিরিয়ে নিতে বল এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে বাড়িতে রাখ। অতঃপর মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তালাক দেবে'' (বুখারী ৪৯০৮)।

তালাকে বিদয়ী ঃ হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় তালাক দেওয়া, হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সহবাস করে তালাক দেওয়া এবং একসঙ্গে তিনবার তালাক দেওয়া হল তালাকে বিদয়ী।

ইদ্দত কী ঃ ইদ্দত হল তালাক দেওয়ার পর যে সময়কাল পর্যন্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীকে বহন করতে হয় এবং যে সময় কালের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে বিনা বিবাহে পুনরায় ফেরত নিতে পারে। মহিলাদের প্রকারভেদে ইদ্দতের সময়সীমা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন (ক) নিয়মিত মাসিক হয় এমন মহিলাদের জন্য ইদ্দত হল তিন হায়েয বা মাসিক (সূরাতুল বাক্বারাহ্ ২২৮)। (খ) মাসিক হয়ই না বা মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এমন মহিলাদের জন্য ইদ্দত হল তিন মাস এবং (গ) গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ইদ্দতের মেয়াদ হল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (সূরাতুত্ তালাক, আয়াত নং ৪)।

ইদ্দতের গুরুত্ব ঃ তালাক দেওয়ার পর কয়েকটি কারণে ইদ্দত গণনা করা খুবই জরুরী। (১) বিনা বিবাহে স্ত্রীকে ইদ্দত বা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই রাজআত অর্থাৎ ফেরত নেওয়া যায়। (২) ইদ্দতের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে তালাকে বাইন হয়ে যায়, তখন আর বিনা বিবাহে স্ত্রীকে ফেরত নেওয়া যায় না। নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে পুনরায় বিবাহ করতে হয় এবং (৩) ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য যে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বিন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, ইদ্দতের মধ্যে নয়।

তালাকে রাজয়ী দুই বার ঃ তালাকে রাজয়ী হল এমন তালাক যে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা বা সহবাসের মাধ্যমেই ফিরিয়ে নিতে পারবে বা আত্মীয়স্বজনরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও তাদের মধ্যে মিল করে দিতে পারেন।

তালাকে রাজয়ী জীবনে দু-বারই দেওয়া যায় অর্থাৎ দু বার তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে দুবার ফিরিয়ে নেওয়া যাবে বিনা বিবাহে। আল্লাহ্ বলেন, 'তালাক (রাজয়ী তালাক) হল দুই বার' (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২২৯)। মনে রাখতে হবে যে, রাজয়ী তালাকের ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রী স্বামীর গৃহে থাকবে এবং যাবতীয় খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে।

তালাকে রাজয়ীর মেয়াদ পার হলে তালাকে বাইন ঃ তালাকে রাজয়ীর ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে বাইন তালাক হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় দেনা পাওয়া মিটিয়ে দিয়ে এবং মোহরানা ফেরত না নিয়ে সুস্থ পরিবেশে স্ত্রীকে বিদায় জানাতে হবে। তালাকে বাইনের পর পুনরায় স্ত্রীকে নিতে চাইলে মোহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, বাইন তালাকের পর দুবার নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে পুনরায় বিবাহ করা যায়।

তৃতীয়বার তালাক ও তার বিধান ঃ তৃতীয়বারে তালাক দিলে রাজআত বা ফেরত নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সরাসরি তালাকে বাইন হয়ে যাবে। তালাকে বাইনের নিয়ম মেনে স্ত্রীকে আর বাড়িতে রাখা যাবে না বরং সুস্থভাবে হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে অভিভাবকের গৃহে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রী ইদ্দত অতিবাহিত করে, যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসার ধর্ম পালন করার পর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেও তালাকে বাইনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারে (সূরা বাক্বারাহ্ ২২৯)। মনে রাখতে হবে যে, একজন মহিলার জীবনে দু-দুটো স্বামীর সঙ্গে সংসার করে পুনরায় তৃতীয়বারে প্রথম স্বামীর নিকটে ফিরে আসার ঘটনা খুবই বিরল। একে তো মহিলারা সন্তানাদি হয়ে গেলে প্রথম স্বামীর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চায় না, তার উপর দুটো স্বামীর পরিত্যক্ত হয়ে আবার প্রথম স্বামীর নিকটে ফিরে আসার মানসিকতা আর থাকবে না — এটাই স্বাভাবিক।

তাহলীল ঃ তৃতীয়বার তালাক দেওয়ার পর বা একসঙ্গে তিনবার তালাক বলাকে তিন তালাক ধরে নিয়ে স্ত্রীকে পুনরায় প্রথম স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে বিবাহ দেওয়া এবং শর্ত পূরণ করে পুনরায় তালাকের ব্যবস্থা করে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি হল তাহলীল। এটি একটি শরীআত বিরোধী পন্থা। এই পন্থা ভারতীয় উপমহাদেশে হানাফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী তারা তৃতীয় তালাক বা একসঙ্গে তিনবার তালাককে তৃতীয় তালাক হিসাবে গণ্য করে, শর্ত সাপেক্ষ অন্য

কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় এবং বাসর রাত যাপন করে পরের দিন পুনরায় তালাকের ব্যবস্থা করে পুনরায় প্রথম স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ পদ্ধতিতে কয়েক দিক থেকে শরীআতের বিধান লঙ্ঘিত হয় ঃ—

(ক) এক সঙ্গে তিনবার তালাক বলাকে তিন তালাক হিসাবে গণ্য করা হয়। যা শরীআতের পরিপন্থী।

(খ) একসঙ্গে তিন হল তালাকে বিদয়ী। সুতরাং এটা তালাক হবে কি হবে না তা নিয়েই তো মতপার্থক্য রয়েছে। তালাকে বিদয়ীকেই তালাক হিসাবে গণ্য করা হয়।

(গ) তড়িঘড়ি করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হালালাকারীরা ইদ্দতের বিধানকে লংঘন করে।

(ঘ) সর্বোপরি শর্তসাপেক্ষ বিবাহ এবং চুক্তিভিত্তিক রাত্রিবাস শরীআতের খেলাফ, নারী সম্মানের পরিপন্থী ও সুশীল সমাজের কলঙ্ক।

(ঙ) কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের কোথাও এ পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয় নি।

(চ) হালালাকারী ও যার জন্য হালালা করা হচ্ছে উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হয় (আবূ দাউদ, বাবুন ফিত্ তাহলীল, আলবানী রহমাতুল্লাহে আলাইহি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)। সুতরাং তাহলীল পদ্ধতি সর্বাবস্থায় পরিহার যোগ্য।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ও কেন্দ্রিয় সরকারের অবস্থান ঃ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় হল এই যে, এক বৈঠকে তিন তালাক সিদ্ধ নয় বরং তা এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে। সুপ্রিম কোর্টের এ রায় প্রত্যক্ষভাবে শরীআতেরই রক্ষাকবচ। তবে পার্লামেন্টে তালাকের বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে সরকারের উদার মনোভাবকে কালিমালিপ্ত করেছে। কেননা সরকার যদি মুসলিম মহিলাদের ভালোই চান, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাস্তবায়ণ করলেই সমস্যা দূরীভূত হয়ে যেত। তিন তালাক প্রদানকারী স্বামীকে জেলে বন্দিদশায় থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ বহন করতে হবে — এ সিদ্ধান্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক। আমরা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিম বাংলার পক্ষ থেকে সরকার বাহাদুরকে সাধুবাদ জানাব যদি সত্যিই প্রচলিত তিন তালাক প্রথা বন্ধ করে শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী তালাক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু সরকারের মনোভাব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা তারা পক্ষান্তরে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকেই তুলে দিতে চায়। এ কারণে আমরা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস তালাক নয় বরং ল বোর্ডের রক্ষার্থে সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপীল জানাচ্ছি যেন অবিলম্বে এ বিষয়ে পুনরায় সংশোধনী বিল আনা হয় এবং সুস্থ সমাধানের পথ অন্বেষণ করা হয়।

খোলা ঃ প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে যেভাবে স্বামী নিজ স্ত্রীকে প্রয়োজনে নিয়ম মেনে তালাক পদ্ধতির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে ঠিক সেভাবেই স্ত্রীও প্রয়োজনে স্বামীর নিকট থেকে খোলা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অবশ্য খোলার কতকগুলি জরুরী নিয়ম রয়েছে। যেমন — (ক) স্ত্রী স্বামীর নিকটে তালাক নিলেও সে তালাক রাজয়ী হবে না। বরং তা হবে খোলা। (খ) খোলা নিলে স্ত্রীকে স্বামীর দেওয়া সব কিছুই এমনকী মোহর পর্যন্ত ফেরত দিতে হবে। অবশ্য স্বামী স্বেচ্ছাই না নিলে তা স্বতন্ত্র বিষয়। খোলার ইদ্দত হল এক হায়েয বা এক মাস। ইদ্দত অতিক্রম করলে বা ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর নিকটে ফিরতে চাইল নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফাসখ নেকাহ ঃ যখন স্ত্রীর আবেদন করা সত্বেও স্বামী তালাক দিচ্ছে না, তখন স্ত্রী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যে সমাজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেই সমাজের হাতে নেকাহ্ ফাসখ করারও অধিকার আছে স্ত্রীর আবেদনের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে নেকাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে।

বাতিল নেকাহ ঃ (ক) অলীর অনুমতি ব্যতীত মহিলার বিবাহ। (খ) অন্যকে মিথ্যা অলী দেখিয়ে বিবাহ বাতিল। (গ) ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহ বাতিল।

অবশ্য পুরুষের ক্ষেত্রে বিবাহ করার জন্য অলীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। অলীর অনুমতি ব্যতীতই বিবাহ সিদ্ধ।

বাতিল খোলা ঃ যে সমস্ত মহিলারা নিজেরাই কোর্টে গিয়ে স্বামী বা সমাজকে না জানিয়ে কোর্টে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে তাদের খোলা সিদ্ধ নয়। বরং তা হারাম ও বাতিল।

ব্যাভিচারের পর নিকাহ্ ঃ ব্যাভিচারের পাপ মোচন করার জন্য নিকাহ দেওয়া শরীআতের বিধান নয়। বরং বিধান হল আগে ব্যাভিচারের হাদ বা শাস্তি ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিনীর প্রতি কায়েম করতে হবে। বিবাহের বিষয়টি পরে।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে নিকাহ্ ও তালাকের বিষয় যথাযথভাবে অনুধাবন করার ও সেই মুতাবিক আমল করার সামর্থ দাও— আমীন।

ভুল সংশোধনের নববী পদ্ধতি

আব্দুর রাকীব মাদানী

আল্ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্ স্বলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ ঃ

ভুল-ত্রুটি হওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষ মাত্রই ছোট বড় ভুলের শিকার। তাই মানুষ ভুল করে তার বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে। ভুল করে রাস্তা-ঘাটে এবং দোকান পাটে। ভুল করে নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং অন্যদের সাথে। ভুল করে দ্বীনী বিষয়ে এবং দুনিয়াবী বিষয়েও। বলা হয়েছে, মানুষের ভুল হওয়াটা বড় ভুল নয়; বড় ভুল হচ্ছে ভুলকে সংশোধন না করে ভুলের উপর অটল থাকা।

আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামে রয়েছে ভুল সংশোধনের চমৎকার নীতি। প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হচ্ছেন এ বিষয়ে আমাদের উত্তম আদর্শ। তাঁর সীরাত এবং সুমধুর আচরণে রয়েছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত যা থেকে আমরা ভুল সংশোধনের কিছু নীতি-নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসন্ধান পেতে পারি। নিম্নে তারই কিছুটা তুলে ধরা হল —

১ম পদ্ধতি ঃ ভুল যত বড় হবে সেই ভুল সংশোধনের গুরুত্বও তত বেশি পাবে। তাই শির্ক ও কুফরীর মত ভুল এবং মুস্তাহাব কাজের ভুল সমান হতে পারে না। যদি ভুলকারীর ভুল শির্ক সংক্রান্ত হত, তাহলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার সংশোধনে বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। যেমন —

(ক) নাবীপুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় সূর্যে গ্রহণ লাগলে লোকেরা বলাবলি করে যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে আজ সূর্যে গ্রহণ লেগেছে। উল্লেখ্য যে, সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আর এর গ্রহণ লাগার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন এবং এমনটা আল্লাহ্‌র আদেশে ঘটে থাকে। কারো মৃত্যু বা জীবিতের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। তারপরও যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, মহান ব্যক্তির মৃত্যু চন্দ্র বা সূর্যে গ্রহণ লাগার কারণ, তাহলে সে গ্রহণকে এমন কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিল যা ইসলামে কারণ করা হয়নি। আর এমন ভাবা এক প্রকারের শির্ক। অনুরূপ এমন বিশ্বাসকারী জীবন-মরণের মধ্যে এমন ক্ষমতা বিশ্বাস করলো যে ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী কেবল মহান আল্লাহ্। আর তা তাঁর মাখলূকের মাঝে মনে করা শির্ক। এমন বিশ্বাস নিরসনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দারুন সতর্ক থাকতেন এবং কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়াই গুরুত্বের সাথে তা বর্ণনা দিয়ে খণ্ডন করতেন; কারণ বিষয়টি ভয়াবহ শির্কের বিষয়।

قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ يوم مات ابراهم فقال رسول الله ﷺ ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فاذا رأيتموهما فادعوا الله و صلوا حتى تنكشف.

যিয়াদ বিন আলাকাহ্ বলেন ঃ আমি মুগিরাহ্ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পুত্র ইবরাহীম যেদিন মারা যায়, সেদিন সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল। লোকেরা বলল ঃ ''ইবরাহীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যে গ্রহণ লেগেছে।'' তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটিতে গ্রহণ লাগে না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করবে এবং স্বলাত আদায় করতে থাকবে'' (সহীহ্ মুসলিম, কসূফ অধ্যায় নং ৯১৫, বুখারী নং ১০১২)।

(খ) মক্কার মুশরিকারা বিশেষ এক গাছের নিকট অবস্থান করত এবং আপন যুদ্ধ সরঞ্জাম সেই গাছে ঝুলিয়ে রাখতো। এরা সেই গাছ থেকে কল্যাণ পাবার আশায় করত। কিন্তু কল্যাণ করা বা ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা কোনো গাছের মধ্যে নেই। এমন বিশ্বাস হচ্ছে শির্ক। কিন্তু অনেক সময় তা শির্ক না হলেও শির্কের কারণ বটে। যেমন কেউ যদি গাছকে বরকত লাভের অসীলা মনে করে। তা স্বয়ং শির্ক হোক কিংবা শির্কের মাধ্যম হোক, উভয়ের সম্পর্ক শির্কের সাথে রয়েছে। এমন বিশ্বাস নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সাহাবী আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

করে তাহলে সেটা হবে (অদৃশ্যের জ্ঞানী) এর গুণে মহান আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশী করা যা শির্ক। এমন বিশ্বাসের নিরসন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গুরুত্বের সাথে স্পষ্ট ভাষায় করেছেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

من اتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.

যে ব্যক্তি গণক-জ্যোতিষীর কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা সে সত্য মনে করলো, তাহলে সে অস্বীকার করলো যা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (আহমাদ ২/৪২৯, বাযার ৩০৪৪, তারগীব ৪৪৬৭, হাফেয ইবনু হাজার হাদীসের সূত্রকে হাসান বলেছেন, ফাতহ ১০/২১৭)।

(ঘ) সাজদা হচ্ছে ইবাদাত। তা কেবল মহান আল্লাহ্‌র জন্য করা হবে। চন্দ্র, সূর্য কিংবা কোনো নেক ব্যক্তি এমনকী নাবীর জন্যও করা নিষেধ। এমন করলে তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত বা শির্ককারী হবে। এমন ঘটনা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে ঘটলে তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেন।

عن عبد اللّٰه بن أبى أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى ﷺ فقال : ما هذا يا معاذ؟ قال : أتيت الشام فوجدتهم يجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك يا رسول اللّٰه فقال رسول ﷺ لا تفعلوا ذلك فانى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আউফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মাআয যখন সিরিয়া হতে ফেরত আসলো, তখন সে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সাজদা করলো। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন ঃ মাআয এটা কী করলে? তখন সে বলল ঃ আমি সিরিয়ায় দেখলাম তারা তাদের ধর্মীয় নেতাদের সাজদা

خرجنا مع النبى ﷺ قبل حنين، ونحن حديثو عهد بكفر، و للمشركين سدرة يعكفون عليها، و ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط فقال النبى ﷺ " الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى لموسى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) ثم قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، لتركبن سنن من كان قبلكم"

আমরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে হুনাইনের দিকে বের হলাম। সে সময় আমরা নতুন নতুন মুসলিম হয়েছিলাম। মুশরিকদের একটি কুলের গাছ ছিল যেখানে তারা (বরকতের আশায়) অবস্থান করত এবং নিজেদের অস্ত্রসমূহকে তাতে টেঙিয়ে দিত, যাকে যাতু আনওয়াত (টাঙ্গানোর গাছ) বলে ডাকা হত। এমন সময় আমরাও এক কুলবৃক্ষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তা দেখে আমরা বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের জন্যও একটি কুলগাছ নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের কুলগাছ রয়েছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তখন (আশ্চর্যের সাথে) বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! এটা তো তেমন কথা যেমন মূসার (আলাইহিস্ সালাম) সম্প্রদায় তাকে বলেছিল (আমাদের জন্য একটি উপাস্য নির্ণয় করে দাও যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে) অতঃপর তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা অজ্ঞ সম্প্রদায়। নিশ্চয় তোমরা পূর্বের সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে (আহমাদ, তিরমিযী নং ২১৮০, ইবনু হিব্বান ৬৭০২ হাদীসটি সহীহ্)।

(গ) অজ্ঞতার যুগে এমনকী বর্তমান যুগেও এমন লোকের ঘাটতি নেই যারা গণক, জ্যোতিষী এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তি যারা ভবিষ্যৎ বাণী করে কিংবা ভবিষ্যতের বিষয়ে সংবাদ দেয় কিংবা হারানো বস্তু সম্পর্কে সংবাদ দেয়, তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে যে, তারা গায়েব বা অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত অর্থাৎ তারা গায়েব জানে। এমন বিশ্বাস শির্কী বিশ্বাস কারণ গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক কেবল মহান আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন আলিমুল গায়েব। যদি কেউ এই গুণটিকে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মধ্যে বিশ্বাস

করছে। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম ঃ আমরা রসূলের জন্য এমন করবো। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন ঃ এমন করো না। কেননা যদি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সাজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সাজদা করতে আদেশ করতাম (আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনু মাজাহ্ ১৮৫৩, ইবনু হিব্বান ৪১৭১, সিলসিলাহ্ সহীহ্ ১২০৩)।

(ঙ) শির্ক নয় কিন্তু তার মাধ্যমে যদি শির্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো তাহলেও তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খুব গুরুত্বের সাথে তা নিষেধ করতেন। যেমন মৃত্যুকালে তাঁর কবরকে মসজিদ না করার অসিয়ত (সহীহ্ মুসলিম নং ৫৩২)। উঁচু কবর ভেঙ্গে বরাবর করে দেওয়া (সহীহ্ মুসলিম ৯৬৯)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)কে কেন্দ্র করে অতিরঞ্জন না করা (বুখারী ৩৪৪৫)। নেক লোকদের ছবি তৈরি করে টাঙিয়ে রাখা (বুখারী ৪২৭, মুসলিম ৫২৮) প্রভৃতি।

২য় পদ্ধতি ঃ ভুলের পরিণাম সুদূরপ্রসারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ভুল সংশোধনে বিলম্ব না করা; বরং যত তাড়াতাড়ি তা সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া। কারণ সঠিক সময়ে তা সংশোধন করা না হলে, হতে পারে পরে তা লাভজনক হবে না কিংবা বিষয়টি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে কিংবা সুযোগ হারিয়ে যাবে এবং পরে বিষয়টি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এমনকী ভুলকারী এও ভাবতে পারে যে, তার ভুল হয়নি; হলে তাকে সংশোধন করা হত।

এ সম্পর্কে মাখযূমী মহিলার চুরি করার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت، فقالوا : و من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا : و من يجترئ عليه الا أسامة بن زيد؛ حِبّ رسول الله ﷺ فكلّمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ : أتشفع فى حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال : انما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركه، و اذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

মাখযূম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রসূলুল্লাহ্‌র প্রিয়তম উসামা বিন যাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে আলাপ করার সাহস করতে পারে। উসামা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে কথা বলল ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিনীর শাস্তি মকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন ঃ তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরীব লোক চুরি করত, তখন তার উপর দণ্ড জারি করত। আল্লাহ্‌র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম (বুখারী নং ৩২৮৮)।

এই ভুলের সংশোধন সঠিক সময়ে না হলে এর ভয়াবহ পরিণাম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ্‌র হুদূদ বা দণ্ডবিধানে হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইসলামে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ আসার সম্ভাবনা ছিল। তাই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অতি সত্তর তা নিরসনে সচেষ্ট হন।

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ ভুলকারী যদি অজ্ঞতার কারণে ভুল করতো, তাহলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার সংশোধন নম্রতার সহিত করতেন। যেমনটি সাহাবী মুআবিয়া বিন হাকাম আস্ সুলামী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন —

قال : بينا أنا أُصلِّى مع رسول الله ﷺ اذ عطس رجل من القوم، فقلت : يرحمك الله، فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت : و اثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون الى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على

أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوننى، لكنى سكت، فلما صلّى رسول الله ﷺ فبأبى هو وأمى، ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى، قال : ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس، انما هو التسبيح و التكبير، و قرائة القرآن.

একদা আমি রসূলুল্লাহ্ সাথে স্বলাত আদায় করছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি বললাম ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ্ (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুক)। এর ফলে মানুষেরা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। আমি বললাম, কী ব্যাপার তোমরা আমার দিকে (এমন করে) তাকাচ্ছ কেন? (কথা না বলে) তারা নিজ হাত দ্বারা উরু থাপড়াতে লাগলো। যখন বুঝতে পারলাম তারা আমাকে চুপ হতে বলছে, তখন আর কথা না বলে চুপ হয়ে গেলাম। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাত শেষ করলেন - আমার পিতা-মাতা তাঁর উপর কুরবান যাক - আমি পূর্বাপর তার থেকে উত্তম শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, প্রহার করলেন না, আর না মন্দ কিছু বললেন। বরং তিনি বললেন ঃ স্বলাত; তাতে সাধারণ কথা-বার্তা বৈধ নয়; তা তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন পড়ার স্থান (সহীহ্ মুসলিম, মাসজিদ অধ্যায় নং ৫৩৭)।

অনুরূপ আরও এক অজ্ঞ বেদুইনের ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন ঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء أعرابىٌّ فبال فى طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبى ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه.

একদা এক বেদুইন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে প্রস্রাব করে দেয়। লোকেরা তাকে ধমক দিলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের নিষেধ করেন। তার মূত্রত্যাগ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্র রসূল এক বাল্টি পানি ঢেলে দিতে আদেশ করেন (বুখারী, মুসলিম)।

এখানে উপরোক্ত দুটি ঘটনাতেই ভুলকারী অজ্ঞ ছিল; কারণ তারা বেদুইন তথা শহরের বাইরে গ্রামে বসবাসকারী ছিল। তাই তাদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাদের ভুল সংশোধনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নম্রতা অবলম্বন করেন।

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ ভুলকারীর প্রতি দয়া করা ও সদয় হওয়া। এ নিয়ম তাদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য যে ভুল করার পর লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয় এবং তাওবাকারী হয়।

ইমরান বিন হুসাইন হতে বর্ণিত, একদা জুহায়না গোত্রের এক মহিলা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট আসলো, যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে গর্ভবতী ছিল। সে বলল ঃ আল্লাহ্র নাবী আমার উপর আল্লাহ্র দণ্ড জরুরী হয়ে গেছে তাই আমার উপর দণ্ড জারি করুন। এ শুনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সেই মহিলার অভিভাবককে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এর দেখাশোনা করো যখন সন্তান জন্ম দিবে, তখন আমার কাছে নিয়ে এসো, তাই করা হল। তার উপর দণ্ড বাস্তবায়ণ করার হুকুম দেওয়া হল এবং তাকে রজম করে দেওয়া হল। অতঃপর আল্লাহ্র রসূল তার জানাযার স্বলাত পড়লেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আল্লাহ্র নাবী! আপনি তার জানাযার স্বলাত পড়ছেন; অথচ সে ব্যাভিচারিনী ছিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যে, তা যদি মদীনাবাসীর ৭০ জন পাপী লোকের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তো সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এর চেয়ে বড় তাওবা আর কী হতে পারে যে, সে নিজ জীবনকে (আল্লাহ্র ফয়সালার সামনে) সোঁপে দিয়েছে (সহীহ্ মুসলিম নং ১৬৯৬)।

এখানে দেখা যাচ্ছে, ভুলকারী একজন মহিলা হওয়া সত্বেও সে তার সমস্ত লজ্জা ও তিরষ্কার মাথায় নিয়ে ভীষণভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার উদ্দেশ্যে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছে। এমন সময় ভুলকারী দয়া পাবার পাত্র তিরস্কার পাবার নয়।

পঞ্চম পদ্ধতি ঃ ভুলের শারঈ বিধান উল্লেখ করতঃ সংশোধন করা ঃ

عـن جَـرْهَـدٍ رضى الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَ هُوَ كَـاشِفٌ عَـنْ فَـخِـذِهِ، فَـقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ.

জারহাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যে সময় সে তার উরু খুলে রেখেছিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''তোমার উরুকে ঢেকে দাও; কারণ তা পর্দার অন্তর্ভুক্ত '' (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহ্ বলেছেন)।

ষষ্ঠ পদ্ধতি ঃ ভুলে শাস্তি উল্লেখ করত ঃ সংশোধন করা ঃ

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একদা এক সাহাবীর হাতে বালা দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী উদ্দেশ্যে? সে বলল, ওয়াহেনা (একপ্রকার রোগ) রোগের কারণে পরেছি। আল্লাহ্র রসূল বললেন, ''তা খুলে ফেল, কারণ তা পরে থাকলে ওয়াহেনাই বৃদ্ধি পাবে। যদি তুমি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও তাহলে কখনো সফলকাম হবে না'' (আহমাদ, সূত্র গ্রহণীয়)।

অষ্টম পদ্ধতি ঃ ভুলকারীকে তার ভুল শোধরাতে স্বয়ং বার বার সেই কাজটি করার আদেশ দেওয়া যেন তার স্মরণ থাকে এবং পরে আর ত্রুটি না হয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো যে সময় রসূলুল্লাহ্ মসজিদের এক প্রান্তে বসে ছিলেন। সে ঢুকে স্বলাত আদায় করলো এবং আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে এসে সালাম করলো। আল্লাহ্র রসূল সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং স্বলাত আদায় করো কারণ তুমি স্বলাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে প্রথমে যেভাবে স্বলাত পড়েছিল সেভাবেই স্বলাত পড়লো। অতঃপর এসে আবার নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সালাম দিল। আল্লাহ্র রসূল বললেন, ওয়া আলায়কাস্ সালাম। তুমি ফিরে যাও আবার স্বলাত আদায় করো কারণ তুমি স্বলাত আদায় করনি। সে দ্বিতীয়বারে কিংবা তৃতীয়বারে বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনাকে যিনি সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন এর থেকে ভাল করে আমি স্বলাত পড়তে জানি না। আল্লাহ্র রসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''যখন স্বলাত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন পূর্ণরূপে অযু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর দিবে। অতঃপর কুরআন হতে যা সহজ তা পড়বে। তারপর রুকু করবে এবং রুকুতে স্থির হবে। তারপর রুকু থেকে উঠবে এবং স্থির হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সাজদা করবে এবং সাজদায় স্থির হবে। তারপর উঠে বসবে এবং বরাবর হয়ে বসবে। অতঃপর তুমি তোমার সকল স্বলাতে এমন করবে'' (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্, আহমাদ)।

নবম পদ্ধতি ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উক্তির উদ্দেশ্য বুঝতে কারো ভুল হলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পুনরায় তাদের স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে বলতেন এবং অনেক সময় নির্দিষ্টরূপে নাম না নিয়ে আম তথা অনির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করতেন; যেন ভুলকারীকে আঘাত না লাগে বা সে লজ্জা না পায়।

عـن أنـس بـن مـالك رضـى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهـط الى بـيوت أزواج النبى ﷺ يسألون عن عبادة الـنبى ﷺ، فلما أُخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: و أين نـحـن من النبى ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و مـا تأخر؟ قال أحدهم : أما أنا فانى أصلى الليل أبدًا، و قـال آخـر : أنا أصوم الدهر و لا أفطر، و قال آخر : أنـا أعتـــزل الـنسـاء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله ﷺ، فـقـال : أنتـم الـذين قلتم كذا و كذا، أما و الله انـى لأخشـاكم لله و أتـقـاكم له؛ لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتـزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى.

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি

বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলের স্ত্রীর নিকট এসে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর রাতের ইবাদাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। তারা শুনার পর নিজের সৎ আমলকে অতি সামান্য মনে করলো এবং বললো ঃ রসূল যার আগে-পরের গুনাহ মাফ তিনি যদি এতখানি ইবাদাতকারী হোন, তাহলে আমাদের কেমন হওয়া উচিত? তাদের একজন বললো, আমি আর রাতে ঘুমাবনা (সারা রাত জেগে ইবাদাত করবো)। আর একজন বললো, আমি সারা বছর সিয়াম পালন করবো ইফতার করবো না। তৃতীয়জন বললো, আমি কখনো বিবাহ-শাদী করবো না। ইত্যবসরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঘর থেকে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা এমন এমন মন্তব্য করেছো। দেখ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয়কারী; তা সত্বেও আমি সিয়াম রাখি আবার কখনো কখনো রাখি না (নফল সিয়াম), (রাতে তাহাজ্জুদের) স্বলাত পড়ি এবং নিদ্রাও যাই এবং বিবাহও করি। তাই যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী ৪৭৭৬, মুসলিম ১৪০১)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, ''লোকদের কি হয়েছে তারা এমন এমন মন্তব্য করছে.... '' (বুখারী ৫০৬৩)।

এখানে সেই তিন সাহাবী নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বক্তব্য বুঝতে ভুল করায় ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল তাই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্য উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এবং তাদের নাম উল্লেখ না করে সাধারণভাবে সম্বোধন করলেন।

দশম পদ্ধতি ঃ ধমক দিয়ে ভুল সংশোধন করা। ধমক শ্রবণকারীর সম্পর্কে যদি বিশ্বাস থাকে যে, ধমক দিয়ে তার উপর মন্দ প্রভাব পড়বে না তখন এই নিয়ম অবলম্বন করা যায়। কিংবা একজনের ভুলের কারণে যদি অধিক লোকের কষ্ট হত, তাহলে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার সংশোধন ধমকের কণ্ঠেও করতেন।

মাআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পাড়ার লোকদের লম্বা সূরা দিয়ে স্বলাতের ইমামতি করলে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করা হয়। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মাআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, ''হে মাআয তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী''? (বুখারী-মুসলিম নং ৪৬৫)।

একাদশতম পদ্ধতি ঃ বাচ্চাদের ভুল সংশোধনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মায়া-মমতার নীতি অবলম্বন করতেন।

উমার বিন আবী সালমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূলের গৃহে ছোট শিশু ছিলাম। আমার হাত খাদ্যের প্লেটে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করত। তখন আল্লাহ্‌র রসূল আমাকে বললেন, হে বালক! আল্লাহ্‌র নাম নাও, তোমার ডান দিক হতে খাবার খাও এবং তোমার দিক হতে তোমার নিকটে যা রয়েছে তা খাও। তারপর থেকে আমার খাবার ধরণ সবসময় এমনই ছিল (বুখারী নং ৫০৬১, মুসলিম)।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র রসূলের খিদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম তিনি কখনো আমাকে উফ! পর্যন্ত বলেন নি। আর না কোনো কিছুর কারণে বলেছেন যে, এমন কেন করেছো? বা এমনটা করতে হত (সহীহ্ মুসলিম নং ৪৩৯২, ফাযাইল অধ্যায়)।

দ্বাদশতম পদ্ধতি ঃ দুনিয়াবী বিষয়ে নিজের ভুল স্বীকার করার মাধ্যমে সংশোধন করা ঃ

রাফি বিন খদীজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মদীনায় আসেন তখন দেখলেন মানুষেরা তাবির করছে (খেজুরের পুরুষ ফুল নিয়ে তা খেজুরের স্ত্রী মধ্যে মিলিয়ে দিচ্ছে)। আল্লাহ্‌র রসূল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কী করছে? তারা বলল ঃ তাবির করছে (এমন করলে খেজুরের ফলন ভাল হয়)। আল্লাহ্‌র রসূল বললেন ঃ মনে হয় এমন না করাই ভাল হবে। তাই তারা তাবির ছেড়ে দেয়। ফলে সে বছর ফলন কম হয়। তখন তারা বিষয়টি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জানালেন। তিনি শোনার পর বললেন, ''আমি একজন মানুষ। যদি আমি তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে আদেশ দিই তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি আমি আমার রায় দ্বারা কোনো কিছুর আদেশ করি, তাহলে মনে রাখো আমি মানুষ'' (মুসলিম নং ২৩৬২, ইবনু হিব্বান, ত্বাবারী)।

সারাংশ স্বরূপ বলা যেতে পারে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সংশোধন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হত। তবে প্রায় সবক্ষেত্রে ভুলকারীর প্রতি দয়ার মনোভাব বজায় থাকতো এবং সংশোধনের উদ্দেশ্য হত, ভুলকারীর ভুলের সংশোধনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, যাকে বলা হয় ইখলাস।

ওয়া সল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ তাসলীমান মাযীদা।

কিয়ামতের আলামত

ইসমাঈল মাদানী

কিয়ামতের আলামত (পূর্বলক্ষণ)গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে — (১) ছোট আলামত, (২) বড় আলামত।

কিয়ামতের ছোট আলামত সমূহ ঃ

১। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আগমন ঃ তিনি বলেছেন —

بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ : وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَ الْوُسْطَى.

অর্থ ঃ আমি এবং কিয়ামত একসাথে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাতের তর্জনী আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় কিয়ামতের আলামত, হাদীস নং ৫৩৮১)।

২। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ.

অর্থ ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে (সূরাতুল কামার ১)।

৩। বাইতুল মাকদিস বিজয় ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مِنْهَا فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

অর্থ ঃ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি বস্তু গণনা করো। তার মধ্যে বায়তুল মাকদিস (ফিলিস্তীন) বিজয় অন্যতম (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল জিযইয়্যাহ, হাদীস নং ৩০০৫)।

৪। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَ حَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُوْلُ الَّذِىْ يَعْرِضُهُ لَا أَرَبَ لِىْ.

অর্থ ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যাকাতের মাল নিয়ে সংকটে পড়বে। যাকাতের মাল মানুষের কাছে পেশ করা হলে সে বলবে ঃ এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং ১৬৮৭, সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ১৩২৯)।

৫। অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمْسِىْ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থ ঃ কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির মত ঘন কালো অনেক ফিতনার আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে আমলের প্রতি শীঘ্র ধাবিত হও। সকালে একজন লোক মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফেরে পরিণত হবে। কিছু সংখ্যক লোক ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিক্রি করে দিবে (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ ফিতনা প্রকাশের পূর্বে আমলের প্রতি শীঘ্র অগ্রসর হওয়া, হাদীস নং ১৮৬)।

৬। ভণ্ড ও মিথ্যুক নাবীদের আগমন ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ ত্রিশজন মিথ্যুক আগমনের পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা সকলেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহ্র রসূল (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কাতাবুল মানাকিব হাদীস নং ৫২০৯)।

৭। হেজায থেকে বিরাট একটি আগুন বের হবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

অর্থ ঃ হেজাযের ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। উক্ত অগ্নির আলোতে

বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হবে (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান হাদীস নং ৬৭০১)।

৮। আমানতের খেয়ানত ঃ

আমানত শব্দটি খেয়ানত শব্দের বিপরীত। আমানতের হেফাজত করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। আখেরী যামানায় আমানতের খেয়ানত ব্যাপকভাবে দেখা দিবে। অযোগ্য লোককে কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

فَـاِذَا ضُيِّـعَـتِ الْأَمَـانَةُ فَـانْتَـظِـرِ السَّاعَةَ، قَالَ : كَيْفَ اِضَـاعَتُهَـا ؟ قَالَ : اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ اِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَـظِرِ السَّاعَةَ.

অর্থ ঃ যখন আমানতের খেয়ানত হবে তখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে বলে মনে করবে। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো ঃ কীভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? নাবীজী বললেন ঃ যখন অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকো (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৬১৩১)।

৯। দ্বীনী ইল্ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اِنَّ مِـنْ أَشْـرَاطِ السَّـاعَةِ : أَنْ يُـرْفَـعَ الْـعِلْمُ وَ يَـثْـبُتَ الْجَهْلُ، وَ يُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَا.

অর্থ ঃ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে এবং যেনার প্রকাশ ঘটবে (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইল্ম, হাদীস নং ৮০)।

১০। অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্যাতনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

১১। যেনা-ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন , ''নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে এবং যেনার প্রকাশ ঘটবে'' (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৮০)।

১২। সুদখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় কিয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে অন্যতম আলামত হচ্ছে সূদ প্রসার লাভ করবে'' (তাবারানী ৬/৩৪৯, হাদীস নং ৭৬৯৫, ইমাম আলবানী সাহেব সিল্সিলাতুল আহাদিস্ আস্ সাহীহাতে সহীহ্ বলেছেন, হাদীস নং ৩৪১৫)।

১৩। গান বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবে।

১৪। মদ্যপান হালাল মনে করবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় কিয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে একটি আলামত হচ্ছে মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে'' (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৮০)।

১৫। মসজিদ নিয়ে মানুষেরা গর্ব করবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

অর্থ ঃ যত দিন লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে ততদিন কিয়ামত হবে না (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, সহীহুল জামে, হাদীস নং ৭২৯৮)।

১৬। দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।

১৭। দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে।

১৮। মারামারি ও হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَاتَـقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا : وَ مَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْقَـتْـلُ الْقَتْـلُ.

অর্থ ঃ হার্জ বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বে কিয়ামত হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! হার্জ কী? উত্তরে তিনি বললেন— হত্যা, হত্যা (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৫১৪৮)।

১৯। সময় দ্রুত চলে যাবে ঃ কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সময় ছোট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। এক বছরকে এক মাসের সমান মনে হবে। এক মাসকে এক সপ্তাহের সমান মনে হবে। এক সপ্তাহকে একদিনের মত মনে হবে এবং এক দিনকে এক ঘণ্টার সমান মনে

হবে" (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী, ইমাম আলবানী সাহেব হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্ সাগীর হাদীস নং ৭২৯৯)।

২০। মুসলিমরা শির্কে লিপ্ত হবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَ حَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ.

অর্থ ঃ আমার উম্মতের বহু সংখ্যক লোক মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া এবং মূর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না (তিরমিযী অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান, ইমাম আলবানী সাহেব হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্ সাগীর, হাদীস নং ৭২৯৫)।

২১। বাজার ঘন ঘন হবে।

২২। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

২৩। মানুষেরা কালো রং দিয়ে চুল-দাড়ি রঙিন করবে।

২৪। কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে।

২৫। ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে।

২৬। ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "বেশি বেশি ভূমিকম্প না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না" (সহীহ্ বুখারী অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইসতিসকা হাদীস নং ১০৩৬)।

২৭। ভূমি ধস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন , "কিয়ামতের পূর্বে চেহারা পরিবর্তন এবং ভূমি ধস ও উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে" (ইবনে মাজাহ্, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান, সহীহুল জামে আস্ সাগীর হাদীস নং ২৮৫৩)।

২৮। পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেওয়া হবে।

২৯। বেপর্দা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৩০। মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হবে।

৩১। সুন্নাতী আমল সম্পর্কে গাফিলতী দেখা যাবে।

৩২। নতুন মাসের চাঁদ উঠার সময় বড় হয়ে উদিত হবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হচ্ছে, চন্দ্র মোটা হয়ে উদিত হবে। বলা হবে এটি দুই দিনের চাঁদ" (তাবারাণী, ইমাম আলবানী হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্ সাগীর, হাদীস নং ৫৭৭৪)।

৩৩। মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে।

৩৪। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন ঘটবে।

৩৫। মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "কিয়ামতের আলামতের মধ্যে অন্যতম আলামত হচ্ছে মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকী পঞ্চাশ জন মহিলার দেখাশুনার জন্য মাত্র একজন পুরুষ থাকবে" (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইল্ম, হাদীস নং ৮১)।

৩৬। হঠাৎ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৭/৩২৫, সহীহুল জামে আস্ সাগীর হাদীস নং ৫৭৭৫)।

৩৭। আরব উপদ্বীপ নদ-নদী এবং গাছপালায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

৩৮। প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল হবে না।

৩৯। ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে।

৪০। জড় পদার্থ এবং হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে।

৪১। ফিতনায় পতিত হয়ে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে।

৪২। কাহতান গোত্র থেকে একজন সৎ লোক বের হবে।

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহ ঃ

১। ইমাম মাহদীর আগমন।

২। দাজ্জালের আগমন।

৩। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর আগমন।

৪। ইয়াজুয-মাজুযের আগমন।

৫। তিনটি বড় ধরণের ভূমি ধস।

৬। বিশাল একটি ধোঁয়ার আগমন।

৭। পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়।

৮। দাব্বাতুল আরজ-এর আগমন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, "একদা রসূল (সল্লাল্লাহু

পরবর্তী অংশ ৫১ পাতায়

মিডিয়া ও বর্তমান সমাজ

অলিউল্লাহ্ সানাবেলী (অধ্যাপক, শামসী কলেজ)

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির (Information & Technology) যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিস্কার মানব জীবনকে অনেক বেশি উন্নত, সহজ ও আরামদায়ক করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে যোগাযোগ মাধ্যম উন্নত হয়েছে বা বিশ্বায়ণের ফলে সারা বিশ্ব একটি ক্ষুদ্র গ্রামে (Global Village) পরিণত হয়েছে এবং এই বিশ্বায়ণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার পিছনে আধুনিক মিডিয়ার অবদান অতুলনীয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খবর, তথ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের খবর আজ প্রত্যেকের হাতের মুঠোয়।

মিডিয়া কী? ঃ ইংরেজী শব্দ Medium এর বহুবচন Media (মিডিয়া), যার অর্থ মাধ্যম। বর্তমান যুগে মিডিয়া (Media) বলতে বোঝায় যোগাযোগের মাধ্যম। যোগাযোগ বা Communication একটি প্রাকৃতিক মানবিক প্রয়োজন যার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে মত বিনিময় ও তথ্যের আদান প্রদান করে। Robert Anderson এর মতে — "Communication is inter change of thoughts, openions and information by speech, writing or signs."

অর্থাৎ ঃ Communication বা যোগাযোগ বলতে বোঝায় কথা, লেখা বা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা, মতামত ও তথ্যের আদান প্রদান।

যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

১। Inter-communication ঃ আন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

২। Group communication ঃ গ্রুপ যোগাযোগ।

৩। Public communication ঃ বৃহত্তর গ্রুপের সহিত প্রকাশ্য যোগাযোগ।

৪। Mass communication ঃ গণ যোগাযোগ।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে মিডিয়া বা মাধ্যমের ব্যবহার হয়। তবে গণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ব্যবহার অপরিহার্য। তাই অনেক সময় Mass communication কে Mass Media বলা হয়।

মিডিয়া মূলত দুই প্রকারের ঃ

১। Print Media ঃ মুদ্রণ ও প্রকাশনাভিত্তিক মাধ্যম। যেমন — দৈনিক খবরের কাগজ, পত্রিকা, পুস্তক, পুস্তিকা, ইস্তিহার ইত্যাদি।

২। Electronic Media ঃ বৈদ্যুতিক মাধ্যম। যেমন — টি.ভি., রেডিও, মোবাইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিফোন, সিডি, ভি.ডি.ও., অডিও, ফিল্ম ইত্যাদি।

বর্তমান যুগে মিডিয়ার গুরুত্ব ঃ মিডিয়া বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিডিয়ার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। অতীতে গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ ছিল ঃ (ক) Legislature (আইন পরিষদ), (খ) Executive (প্রশাসন বিভাগ), (গ) Judiciary (ন্যায় বিভাগ)।

আধুনিক যুগে এই তিনটি স্তম্ভের সহিত একটি চতুর্থ স্তম্ভ যোগ দিয়েছে সেটি হল মিডিয়া। মিডিয়া সরকার গড়তে পারে এবং সরকার ভাঙতেও পারে। মিডিয়া জনমত তৈরি করে ফলে যে কোনো শাসন ব্যবস্থার উপর মিডিয়া প্রভাব ফেলতে সক্ষম। জনসাধরণের নিকট মিডিয়া আজ অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য।

সমাজের উপর মিডিয়ার প্রভাব ঃ মিডিয়া বর্তমান সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেকটি ব্যক্তি মিডিয়ার সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যেন এটি একটি পরিবারের সদস্য। মিডিয়া জনসাধারণের চিন্তাধারা, জীবন যাপন, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্বভাব চরিত্রের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর ও তথ্য অল্প সময়ে অতি সহজে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে যাচ্ছে, ফলস্বরূপ সমাজের চেতনা ও শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তি-তর্ক, আলোচনা, পক্ষ-বিপক্ষের প্রচারের মাধ্যমে সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ ও মানবতার উপর মিডিয়ার কু-প্রভাব ঃ একদিকে যেমন মিডিয়া সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে সমাজে অশান্তি, নৈরাজ্য, হিংসা, ঘৃণা ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধির পেছনেও বড় ভূমিকা পালন করছে। মিডিয়ার কিছু মৌলিক নীতি ও আদর্শ রয়েছে যেমন সত্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা। বহুক্ষেত্রে বর্তমানে মিডিয়া নিজের নীতি-আদর্শ ভুলে যায়। যার ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা

তৈরি হয়। যেমন আজ মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা, সাজানো, ভিত্তিহীন খবর ও ছড়ানো হয় যা সমাজে দ্বন্দ্ব ছড়ায় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইন্টারনেট, হোয়াটস-অ্যাপ (Whatsapp), ফেসবুক, ইউটিউব (You Tube), টুইটার (Twitter) তথা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমে বিকৃত খবর ও বিশ্বের অন্য প্রান্তের ঘটনাকে আমাদের লোকাল ঘটনা বলে রটানো হয়। এই অপপ্রচারের ফলে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। যেহেতু আমরা খুব দ্রুত যে কোনো খবর বা ঘটনা বিশ্বাস করে ফেলি, তাই অতি সহজেই আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। বিগত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে এই ধরণের গুজব বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই সত্যতা যাচাই না করে আমরা যেন কোনো কথা বিশ্বাস না করি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও (সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ৬)।

আল্লাহ্র এই নির্দেশ যদি আমরা পালন করি তাহলে বহুক্ষেত্রে আমরা চক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পাবো।

বহু সমাজ বিরোধী মানুষ মিডিয়ার মাধ্যমে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য ধর্মের নাম ও জাতপাতের নামে মাথায় বিষ ঢোকানো হচ্ছে। সমাজে শত্রুতা ও ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে উগ্র করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই আমাদের সংযত ও অপপ্রচারের উত্তর প্রেম, ভালবাসা, ন্যায় ও কৌশলের মাধ্যমে দিতে হবে, উগ্রতার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্ বলেন—

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

অর্থঃ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না, তোমরা ন্যায় বিচার কর এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী (সূরা মায়িদাহ্ ৪)।

অন্য জায়গায় আল্লাহ্ বলেন —

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! এরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহ্কে গালাগালি দিতে শুরু করবে (সূরা আন্আমন ১০৮)।

বোঝা গেল যে, মিডিয়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি হিংসা ছড়ানো তথা অন্য ধর্ম সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জায়গা নয়, ইসলাম এই ধরণের কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করে।

বর্তমান মিডিয়াতে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার চলছে। ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে অথচ ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কঠোরভাবে বিরোধিতা করে এবং এটি একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আল্লাহ্ বলেন —

مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তারের বিনিময় ব্যতীত তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো (সূরা মায়িদাহ্ ৩২)।

যে ধর্মে একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সারা বিশ্ব মানবতাকে হত্যা করার মত সেই ধর্ম কীভাবে সন্ত্রাসবাদের মত একটি জঘন্য অপরাধকে আশ্রয় দিতে পারে। সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই এই কথা মিডিয়াও স্বীকার করে কিন্তু তাদের ভাষা ও ভাবভঙ্গি বলতে চায় যে ইসলাম সন্ত্রাসবাদের জনক। আরেকটি মারাত্মক প্রবণতা মিডিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, ''সমস্ত মুসলিম সন্ত্রাসবাদী নয় কিন্তু সমস্ত সন্ত্রাসবাদী মুসলিম।''

উক্তিটির দ্বিতীয় অংশ সঠিক নয়। একদিকে যেমন সমস্ত মুসলিম সন্ত্রাসবাদী নয় অন্যদিকে তেমনই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী

মুসলিমও নয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম ছাড়াও বহু অন্য ধর্মের মানুষ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সহিত যুক্ত কিন্তু মিডিয়া তা হাইলাইট করেনা। ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয় দ্বারা ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তে প্রকাশিত নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের তালিকায় যে চল্লিশটি সংগঠনের নাম রয়েছে তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকটির সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের দূরের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতের জাতির জনক এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর হত্যাকারীর কেউই মুসলিম ছিল না। ২০১১ নরওয়ে গণহত্যা, ২০০৭ ভার্জিনিয়া, আমেরিকা স্কুল সুটিং, ২০১৮ ফ্লোরিডা, আমেরিকা স্কুল গণহত্যার মত অজস্র সন্ত্রাসবাদী হামলা অমুসলিমদের দ্বারা হয়েছে। আমেরিকার Nation Institute এর Investigative Fund এর এক গবেষণা অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমেরিকার ১১৫টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তারা কেউই মুসলিম নয়। কিন্তু এসব তথ্য মিডিয়া কোনোদিন সামনে আনেনি। মিডিয়ার এক অদ্ভুদ আচরণ লক্ষ্য করা যায়, যদি কোনো মুসলিম কোনো সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় অভিযুক্ত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়া তাকে সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিয়ে ফেলে। পেপারের প্রথম পাতায় এবং টিভি সংবাদের শিরোনামে মিডিয়া ট্রায়াল (বিচার) চলতে থাকে । কিন্তু যখন সেই অভিযুক্তকে আদালত নির্দোষ প্রমাণিত করে বেকসুর খালাস করে তখন সংবাদ মাধ্যম সেই খবরকে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেনা। অন্যদিকে যদি সন্ত্রাসবাসী ঘটনার সাথে কোনো অমুসলিম যুক্ত থাকে তাহলে প্রথমতঃ সেসব খবর মিডিয়ার কাছে গুরুত্ব পায়না, দ্বিতীয়তঃ অভিযুক্তকে অভিযুক্তই বলা হয় সন্ত্রাসবাদী বলা হয় না, তৃতীয়তঃ অভিযুক্তকে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়। মিডিয়ার এই পক্ষপাতিত্ব ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এবং ফল স্বরূপ বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উগ্র ভি.ডি.ও গেম, ক্রাইম সিরিয়াল, অ্যাকশেন ও থ্রিলার সিনেমা, উগ্র কার্টুন ইত্যাদি কচি-কাচাদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা তৈরি করছে।

লাগামহীন ইন্টারনেট যুবকদের চরিত্র হনন করছে। ইন্টারনেট একদিকে যেমন বহু মূল্যবান তথ্যের ভাণ্ডার, তেমনই এর মধ্যে রয়েছে নগ্ন ছবি, অশ্লীল ভি.ডি.ও., বেশ্যাবৃত্তির প্রচার, অবৈধ যৌন সম্পর্কের সুযোগ সুবিধা ও বহু অশ্লীল জিনিস।

নিয়ন্ত্রণহীন ইন্টারনেট ও মিডিয়ার ব্যবহার সাইবার ক্রাইম (Cyber crime), হ্যাকিং (Hacking) ও বিভিন্ন ধরণের অপরাধকে জন্ম দিয়েছে। অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় কাজে আমাদের বহু মূল্যবান সময় মিডিয়ার মাধ্যমে অপচয় হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় মিডিয়ার ব্যবহার আমাদের আসক্ত ও নেশাগ্রস্ত করে ফেলে। যার ফলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। মিডিয়ার আসক্তি আমাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও বাস্তব জীবন থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চাদেরও উপর মিডিয়ার বহু কু-প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মিডিয়ার কু-প্রভাব ও আমাদের করণীয় ঃ যেহেতু মিডিয়া দুমুখো তলোয়ার তাই তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। অভিভাবকদের কর্তব্য যে তারা যেন মিডিয়া সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন এবং নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এর কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সঠিক মিডিয়া বাছাই করা খুবই জরুরী। মিডিয়া ব্যবহার করার সময় প্রত্যেকটি মুসলিমের মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করছেন, তার নজর থেকে কোনো কিছু লুকায়িত নয়। আল্লাহ্ বলেন — اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী (সূরা নিসা, আয়াত ১)।

তিনি আরো বলেন —

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থ ঃ আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে, এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের (সূরা ইয়াসীন, ৬৫)।

তাই মিডিয়ার অপব্যবহার করার পূর্বে আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর নজরদারি করছেন এবং প্রত্যেকটি কর্মের হিসাব আমাদের দিতে হবে।

মিডিয়ার গঠনমূলক ব্যবহার ঃ যেহেতু মিডিয়া আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাই এটিকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে লাগানো জরুরী। আল্লাহ্ বলেন — اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

অর্থ ঃ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমতের (কৌশল) সহিত (সূরা নাহ্ল, ১২৫)।

আধুনিক যুগে দাওয়াতের কাজে মিডিয়ার ব্যবহার হিকমতের একটি অঙ্গ।

ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার জন্য মিডিয়ার ব্যবহার অপরিহার্য। একটি প্রবাদবাক্য আছে — ''লোহে লোহে কো কাটতা হ্যায়''। মিডিয়ার অপপ্রচারের উত্তর মিডিয়ার দ্বারাই দিতে হবে। পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজে লেখা, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। ওয়েবসাইট ও ব্লগ তৈরি করতে হবে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ট্যুইটার, ইউটিউব ও বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে হবে। ইন্টারনেট তথা মিডিয়ায় যদি কোনো অপরাধমূলক কার্যকলাপ লক্ষ্য করি তাহলে তার অভিযোগ নির্দিষ্ট বিভাগে করতে হবে। সর্বোপরি বর্তমানে আমাদের নিখুঁত ইসলামী মিডিয়া হাউসের অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের মিডিয়ার কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করেন এবং এটিকে দাওয়াতে কাজে ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করেন — আমীন।

---

৪৭ পাতার পর —

আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের কাছে আগমন করলেন, আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ যত দিন তোমরা দশটি আলামত (নিদর্শন) না দেখতে পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। — (ক) ধোঁয়া, (খ) দাজ্জালের আগমন, (গ) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাব্বাতুল আরজ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমন, (ঘ) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়, (ঙ) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমন, (চ) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (ছ) পূর্বে ভূমি ধস, (জ) পশ্চিমে ভূমি ধস, (ঝ) আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, (ঞ) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২৯০১)।

وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ

বিঃ দ্রঃ - কিয়ামতের আলামতগুলিকে বিস্তারিত ভাবে জানতে ডাক্তার ইউসুফ আল ওয়াবিল-এর গ্রন্থ اَشْرَاطُ السَّاعَةِ (আশ্‌রাতুস্ সাআ) পড়ুন।

মাদক দ্রব্যের শারয়ী বিধান

শাইখ জিল্লুর রহমান মাদানী

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলিকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থ ঃ হে মুমিন এই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারকসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও (সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ৯০)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন —

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য সর্বপ্রকার পবিত্র বস্তুকে হালাল করা হয়েছে এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করা হয়েছে (৭/১৫৭)।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে (رِجْسٌ) অপবিত্র আর অপবিত্রকে ব্যবহার করা শয়তানের কাজ। মানুষের কাজ নয়।

খামার কাকে বলে ?

উপরোক্ত সূরাহ্ মায়েদার ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা খামার' নামক বস্তুকে শয়তানের অপবিত্র কাজ বলেছেন। এ বিষয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

অর্থাৎ খামার এমন বস্তু যা সেবন করলে মানুষ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে (বুখারী ঃ ৪৬১৯)।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

অর্থ ঃ প্রত্যেক নেশাযুক্ত বস্তু খামার অর্থাৎ মদ আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত বস্তু হচ্ছে হারাম (মুসলিম ঃ ২০০৩)।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মাদক দ্রব্য হল এমন বস্তু যা সেবনে জ্ঞান হারিয়ে যায়, চায় তা হারাম বস্তুর দ্বারা তৈরি

হোক বা হালাল বস্তুর দ্বারা। আর যার বেশি পরিমাণ সেবন করলে জ্ঞান হারিয়ে যায় তা অল্প পরিমাণ পান করাও হারাম, যদিও বা তাতে জ্ঞান হারা হয় না। كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

সকল পানীয় যা জ্ঞানহারা করে তা হারাম (বুখারী ঃ ৫৫৮৫)। مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. অর্থাৎ যার বেশি পরিমাণ সেবনে বোধশক্তি হারিয়ে যায় তার এক বিন্দু পরিমাণও হারাম (ইবনু মাজাহ্ ঃ ৩৯৩, আবূ দাউদ ঃ ৩৬৮১, হাসান সহীহ্)। مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ. অর্থাৎ নেশাযুক্ত বস্তু যদি ১৬ রতল (৭ কিলো) পরিমাণ খাওয়ার পরেও নেশা হয় তবে তার (হাতের তালু) পরিমাণও খাওয়া হারাম (তিরমিযী ঃ ১৮৬৬, হাদীস সহীহ্)।

উক্ত দলীল সমূহদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো বস্তু যার দ্বারা নেশা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অল্প হোক বা বেশি হোক খাওয়া হারাম।

অধিকাংশ সাহাবাদের এটাই মত। আর ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনু জুঅয়রা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন তেলা নামক শারাব (মদ) সম্বন্ধে তখন ইবনে আব্বাস বললেন যদি তাতে নেশা হয় তাহলে হারাম।

অর্থাৎ পবিত্র হালালের পর জঘন্য হারাম ছাড়া আর কিছুই নেই। এখান থেকে বুঝা যায় যে, হালাল এবং হারামের মাঝে (মকরূহ) বলে কোন জিনিস নেই। হয় হালাল হবে না হয় হারাম হবে। আবু মুসলিম খাওলানী মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শাম (সিরিয়ার) লোকেরা (তেলা) নামক মদ পান করে থাকে। তার জবাবে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

আমার উম্মাতের ভিতরে এক দল মদ পান করবে কিন্তু তার নাম বদল করে দেবে। যেমন বর্তমানে বিভিন্ন নামে মাদক দ্রব্য বিক্রি হয়— যথা মদ, গুটকা, জর্দা, খৈনি ইত্যাদি।

ইমাম সানআনী বুলুগুল মারামের হাদীসের (শারহ্) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুবুলুস্সালাম নামক গ্রন্থে লিখেছেন —

وَيُحَرَّمُ مَا أَسْكَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوْبًا كَالْحَشِيْشَةِ.

অর্থাৎ যে কোনো বস্তু যা জ্ঞানহারা করে দেয় তা হারাম, যদিও তা তরল মাদক দ্রব্য না হোক। যথা হাশিশা (এক ধরণের ফসল বা ঘাস) যার দ্বারা মাদক দ্রব্য তৈরি করা হয়। যেমন আমাদের দেশে তামাক দ্বারা মাদক দ্রব্য তৈরি করা হয়। কেউ যদি বলেন যে, তামাক দ্বারা তৈরিকৃত বস্তুগুলোতে কোনো নেশা নেই বা জ্ঞান শূন্য হয় না। তার কথা সঠিক বলে মেনে নেওয়া যাবেনা। যেমন মদ দ্বারা জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। ঠিক তেমনি দারু, ভাং ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেলে একই অবস্থা দেখা যাবে।

হ্যাঁ! আমরাও বলি তামাক দ্বারা তৈরিকৃত বিড়ি, সিগারেট, খৈনী, জর্দা, গুটকা,পান পরাগ ইত্যাগি খাওয়া বৈধ বা হালাল হবে না। এ সকল বস্তু হারাম হওয়ার জন্য প্রস্তুতকারকের সতর্কী নির্দেশিকাই যথেষ্ট। এসকল বস্তুগুলির প্যাকেটে লেখা আছে 'তামাক ক্যান্সারের কারণ'। সুতরাং বর্তমানে বিশ্বের অভিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়রা সবাই একমত হয়ে বলেন — 'তামাক দ্বারা তৈরি বস্তু যথা বিড়ি, সিগারেট, মদ ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। এগুলো সেবনের ফলে অকালে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে কিছু নেশাদার বস্তুর প্যাকেটে ক্যান্সার আক্রান্ত ফুসফুসের ছবি দ্বারা জনগণকে সাবধান করে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের আত্মাকে হত্যা করো না, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান (সূরা নিসা ঃ ২৯)।

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের আত্মাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেয়ো না (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)।

আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

অর্থাৎ এরকম কোনো কাজ করা যাবে না যার দ্বারা নিজের অথবা অপরের ক্ষতি হবে (ইবনু মাজাহ্ ঃ ২৩৪০, হাসান সহীহ)।

সুতরাং মাদক দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা ব্যবহার করা যাবে না। ইসলামী শরীয়াতে এ রকম সকল বস্তু হারাম।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ রকম হারাম বস্তু থেকে হেফাযতে রাখো — আমীন।

ইসলামের আলোকে নারী ও পুরুষের সহবস্থানের বিধান

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

يَـاَيُّهَـا الـنَّـاسُ اتَّـقُـوْا رَبَّـكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِـدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْـهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَـآءً وَاتَّـقُـوا الـلّٰهَ الَّذِىْ تَسَآئَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানবমণ্ডলি তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একক ব্যক্তি আদাম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হতে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আলাইহাস্ সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমেই অজস্র পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। তোমরা ঐ আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরে যাচঞা করে থাকো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে চলেন (সূরাতুন্ নিসা ১)।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস বলেন—

خُـلِـقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَجُعِلَ نَهْمَتَهَا فِى الرَّجُلِ وَ خُـلِـقَ الـرَّجُـلُ مِنَ الْاَرْضِ فَجُعِلَ نَهْمَتَهٗ فِى الْاَرْضِ، فَاحْبِسُوْا نِسَاءَ كُمْ.

(আদি) নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আদি) পুরুষ (আদম) হতে, সেজন্য পুরুষের প্রতি নারীদের প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। আর (আদি) পুরুষ আদামকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে সেহেতু জমি জায়গার প্রতি পুরুষের চমর আকর্ষণ। অতএব তোমরা নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখো (দ্রষ্টব্য উক্ত আয়াতের তাফসীরে, তাফসীর ইবনু কাসীর ও তাফসীরে আবূ হাতিম)।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির বিস্তারের জন্য নারী পুরুষের বৈধ সম্পর্ককেই আল্লাহ্ জাল্লাশা-নুহু চিহ্নিত করেছেন। সেজন্যই একে অপরের প্রতি অদম্য বাসনা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। উক্ত চাহিদাকে নিবৃত করার জন্য ইসলামে কিছু নীতি নৈতিকতা স্থির করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই যে, তারা যেন নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে পৃথিবীতে পাশবিক পরিবেশের শিকার না হয়। তাছাড়া ইসলামে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূচারু রূপে নিশ্চিত করাটাও অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের সমাজে পর্দা ও হিজাব শব্দদ্বয় বহুলভাবে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কেননা বিরুদ্ধ সেক্সের প্রতি চাহনির মাধ্যমেই প্রথম আকর্ষণের সূত্রপাত হয়। কবি আমর্ ইবনু রাবীআহ্ বলেন —

اَشَارَتْ بِطَرْفِ الْعَيْنِ خِيْفَةَ اَهْلِهَا
اِشَارَةَ مَحْزُوْنٍ وَّ لَمْ تَـتَكَلَّمِ
فَاَيْقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَبًا
اَهْلًا وَّ سَهْلًا بِالْحَبِيْبِ الْمُتَيَّمِ.

পরিবারের ভয়ে (প্রেমিকা) চোখের এক কোণ দ্বারা আমাকে ইশারা করল, ইশারাটা ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায়, সে কথা বলল না। তবে তার চাহনি দ্বারা সে প্রেমাসক্ত বন্ধুকে মাহরাবা ও আহলান সাহ্লান বলছিল।

মহান আল্লাহ্ বলেন — ''হে নাবী! আপনি মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বলে দিন-তারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজের গোপনাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে এটাই তাদের পবিত্র থাকার উত্তম পথ (সূরাতুন নূর, ভাবার্থ ২৮)।

একে অপরের প্রতি সরাসরি সাক্ষাতে যে মনের পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র এই নির্দেশকে সামনে রাখলেও পরিষ্কার হবে —

وَ اِذَا سَـأَلْتُـمُـوْهُـنَّ مَتَـاعًـا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ.

যখন মহিলাদের হতে কোনো বস্তু চাওয়ার প্রয়োজন হবে তখন তোমরা আড়াল হতে তা চাইবে (সরাসরি নয়), এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয় পবিত্র রাখার জন্য খুবই ফলপ্রসূ (সূরাতুল আহ্যাব ৫৩)। দেখলে মনের পরিবর্তন হয় মর্মে এ হাদীসটিও বাস্তব দলীল।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অকস্মাৎ জনৈক মহিলাকে দেখে ফেলেন। (মন পরিবর্তন হওয়ায়) তিনি ততক্ষণাৎ স্বীয় স্ত্রী যায়নাবের গৃহে প্রবেশ করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর বাহিরে এসে (সঙ্গীদের) বললেন, নিশ্চয় মহিলাগণ যখন (খোলামেলা অবস্থায়) আগমন করে তখন সে সম্মোহিনী শয়তানী রূপে আগমন করে। এমন কোনো মহিলাকে দেখে কারো যদি ভালো লাগে ও মন উতলা হয়, তাহলে যেন সে নিজের স্ত্রীর নিকটে আসে (সেটা প্রশমিত করে)। কেননা মহিলাটির কাছে যা আছে, অনুরূপ তার স্ত্রীর নিকটেও রয়েছে (হাদীস সহীহ্, সুনানুত্ তিরমিযী ঃ ১১৫৮)। কেউ যেন এ হাদীস দ্বারা রসূলুল্লাহ্র দুর্বল চরিত্রের দিক অন্বেষণ না করে। কেননা তিনি হলেন মানব জাতির আদর্শ শিক্ষক সমস্ত বিষয়ে। মহান স্রষ্টা তাঁর দ্বারা এমন একটি বারের জন্য সংঘটিত করে কিয়ামাত অবধি উম্মাতের দ্বারা সংঘটিত এমন পরিস্থিতির সমাধান দিয়েছেন। আর এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন স্বামীর চাহিদা পূরণের জন্য স্ত্রীকেও সদা প্রস্তুতি মানসিকভাবে রাখতে হবে। যাতে করে সমাজে পাপাচার অনুপ্রবেশের পথ তৈরি না হয়। ইসলামের এই সুন্দর ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অমান্য করার ফল আজ বিশ্বব্যাপী আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কোলের শিশু কন্যাটিরও রক্ষা নেই।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذِ الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهٗ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَأْتِهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

স্বামী যদি তার বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীকে আহ্বান করে তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দেয়, যদিও সে উনুনের কাজে ব্যস্ত থাকে (সূনানুত্ তিরমিযী ঃ ১১৬০)।

চক্ষুর দুষ্টুমিকে আটকাতে পারলেই অনেকটাই ব্যাভিচার হতে সমাজ সুরক্ষিত থাকবে। সঙ্গত কারণেই মহান আল্লাহ্ একমাত্র স্বামীর নিজের কক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। সেটা নর হোক অথবা নারী, মা হোক অথবা বোন, মেয়ে হোক বা অন্য কেউ। মহান আল্লাহ্ বলেন —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তোমরা স্বীয় কক্ষ ব্যতীত অন্যের কক্ষে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করছ (প্রবেশের) এবং তথায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের সালাম দিচ্ছ। তোমরা যদি উপদেশ গ্রহণ কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমাদের ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের পরিশুদ্ধ থাকার জন্য সহায়ক। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ্ জানেন (সূরাতুন নূর ২৭-২৮)।

এখানে প্রথমে অনুমতি চাওয়া ও পরে সালামের কথা এসেছে। যদিও এখানে বিষয়টি ক্রমধারার জন্য আসেনি। কেননা হাদীসে কথা বলার আগে সালামের নির্দেশ এসেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এটাই আমল ছিল। প্রথম সালামের উত্তর না পেলে পরপর তিনবার সালাম দিতে হবে (সহীহ্ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান)। দরজায় দাঁড়িয়ে গৃহাভ্যন্তরে উকি-ঝাঁকি মারা যাবেনা। কোনো ব্যক্তি এমন করলে তার চোখ ফুটিয়ে দেওয়ার কথাও সহীহ্ হাদীসে এসেছে। সুতরাং অন্যায় দৃষ্টিপাতের কুপ্রভাবের মাধ্যমেই যে ব্যভিচারের বীজ অঙ্কুরিত হয় ব্যক্তিমাত্রই সেটা বোঝেন।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম অকস্মাৎ কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত সম্পর্কে। আল্লাহ্র রসূল আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন' (সহীহ্ মুসলিম ঃ ২১৫৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছিলেন, ''হে আলী! তুমি (প্রথমবার আকস্মিক দৃষ্টিপাতের পরে) বার বার ফিরে দেখবেনা। কেননা প্রথম দর্শন ক্ষমার মধ্যে পড়ে, কিন্তু পরবর্তীগুলি নয়'' (আবূ দাউদ ঃ ২১৪৯)।

মনে রাখা দরকার যে, নিজের কক্ষ বলতে স্বামী-স্ত্রী এককভাবে যে ঘরে থাকে। যে ঘরে মেয়েরা অথবা ছেলেরা থাকে,

সেখানেও সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। হাদীসে তো সরাসরি মায়ের কক্ষে প্রবেশের জন্য জনৈক সাহাবীকে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি যখন বললেন, আমি মায়ের সেবা করি। উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করো? (মিশকাত ৪৬৭৬)। হাদীসটি মুরসাল হলেও আল কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ এই মর্মে এসেছে (দ্রষ্টব্য সূরাতূন নূর ৫৮-৫৯)।

এ পর্যন্ত অলোচনাতে আশাকরি এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, অবাধ মেলামেশা ও খোলাখুলিভাবে যাতায়াত সমাজকে কীভাবে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। তার উপরে বাক্ স্বাধীনতা ও বস্ত্র স্বাধীনতার নামে যেভাবে যৌনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা কারও নিকট নিরাপদ নয়।

মেয়েরা তো নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছে। আর এ বিষয়ে অভিভাবকবৃন্দ আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন। নর ও নারীকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি উভয়ের দুর্বল দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। তিনি বলেন, ''আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে যে সমস্ত কুমন্ত্রণা আনাগোনা করে তা আমি জানি। আমি মানুষের মুখ্য শিরা হতেও নিকটে আছি '' (সূরাহ্ ক্বাফ, ১৬)। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত পোষাক মহিলাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''মেয়েরা যেন নিজের বক্ষের উপর অতিরিক্ত কাপড় লটকিয়ে দেয়'' (সূরাতুন নূর, ৩১)। আমরা তার উল্টোটা দেখছি। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন —

আজিকার জামানায় আধুনিকা বামা
আবরু ঢাঁকিছে তার 'ন' আঙ্গুল জামা।
বুক খোলা, পেট খোলা, আধা বারো আনা,
লুটাইয়া পড়ে তার অঙ্গেরো সীমানা,
লাল-নীল শায়া তার ধুলায় লুটায়,
পার হতে গিয়ে যেন থমকিয়ে যায়।
লজ্জাহীনা, সজ্জা হেরি, শয়তানি আঁখি,
সে নারীরে গিলে খেতে রাখে না কেউ বাকি।
বিদ্যুতের ঝলকানী দেখার জন্য ইচ্ছা করতে হয়,

অটোমেটিক চোখ খুলে যায়। অনুরূপ লোভনীয় কিছু যখন তার শোভা প্রকাশ করে দর্শকদের আহ্বান জানাচ্ছে, তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লৌহ মানব কি কেউ আছে? পুরুষত্বহীন ব্যক্তিও এ 'ফ্রী মুনাফা' করে না হাতছাড়া।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, (কিয়ামতের পূর্বে) (বেশ কিছু) মহিলাগণ কাপড় পরিধান করে থাকলেও উলঙ্গ হবে। লক্ষ্য তাদের পুরুষদের আকর্ষণ করা ও নিজেও তাদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া। তারা রকমারী ডিজাইনে নিজের কেশ বিন্যাস ঘটাবে। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা ও তার সুগন্ধটুকুও লাভ করবেনা (সহীহ্ মুসলিম ঃ ২১২৮)। পুরুষ তার কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা ভালো পোশাক ক্রয় করে, আর তা মহিলাগণ রিজার্ভে রাখে, কুটুম্ব বাড়ি, চিকিৎসালয় ইত্যাদি যাওয়ার জন্য। বাড়িতে অতিসাধারণ পোষাক স্বামীকে প্রদর্শিত হলেও অন্যের জন্য বরাদ্দ থাকে নয়নাভিরাম সাজগোজ। আল্লাহ্ আমাদের সম্পর্কিত মা-বোনেদের সংশোধন করেন।

পথে ঘাটে কোনো প্রকার লুকোচুরি না করেই সন্তানকে স্তন্য দানও উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক। আল্ কুরআনে দুই ব্যৎসর বয়সের বেশি শিশুদের দুগ্ধ দান না করার কথা এসেছে (সূরাতুল্ বাক্বারাহ্ ২৩৩)। কেননা তখন শিশুর মুখে ভাষা এসে যায়। মানুষের সামনে বিশেষ অঙ্গের নাম ধরেই সে দুগ্ধ পান করতে চায়। এতে পুরুষের সুপ্ত চাহিদা জাগ্রত হয়। এটা কেন হয় তা বর্তমানে নেটের যুগে ইউটিউব সার্চ করলেই আমার আলোচনার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্। এছাড়া অঙ্গটির প্রতি যে বিপরীত সেক্সের ভাবনা অন্যরকম তা মেয়েদের ব্রা ব্যবহারের ব্যাপকতা প্রমাণিত করে। কিশোরী থেকে বার্ধ্যকের পরিচয় বহনকারী মহিলাগণও নিজের দেহ সৌষ্ঠব ধরে রাখার জন্য সমানে তৎপর। মহান আল্লাহ্ এ জন্যই বলেন, ''যে সমস্ত মহিলাদের যৌন চাহিদা নেই তারা যদি সাধারণ পোষাকে চলাফেরা করে তাহলে দোষণীয় নয়। তবে তারা যদি সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর'' (সূরাতুন নূর ৬০)। কেননা ফ্রীতে পাওয়া বস্তুর সকলেই খদ্দের। এই আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৃদ্ধা মহিলাদের প্রতি যৌন নির্যাতন প্রমাণিত করেছে।

মূল কথা আমাদের সকলকেই সতর্ক হতে হবে। তবেই আমরা সমাজ, বংশ ও ব্যক্তি বিধ্বংসী পাপাচার হতে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ্। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ইন্‌শাআল্লাহ্ অন্য অবসরের ইচ্ছায় থাকলাম। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন — আমীন।

৪০ পর্ব

كتاب الصلاة ❶

স্বলাতের মাসায়েল

স্বলাতের সময়সূচী - بَابُ اَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

ঊষার উদয় হলে ফজরের সময় শুরু হয় ❶ এবং সূর্যোদয় হলে শেষ হয় ❷	وَ اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اِذَا انْشَقَّ الْفَجْرُ وَ آخِرُهُ طُلُوْعُ الشَّمْسِ.

১ (ক) আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ اِنْشَقَّ الْفَجْرُ وَ النَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফজরের স্বলাত প্রতিষ্ঠিত করতেন, যখন ঊষার উদয় হত এবং মানুষেরা একে অপরকে প্রায় চিনতে পারত না।[১]

(খ) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ফজর দু-প্রকার - (ক) এমন ফজর যাতে খাবার হারাম, স্বলাত জায়েয ও মুবাহ এবং (খ) এমন ফজর যাতে স্বলাত কায়েম হারাম কিন্তু খাবার খাওয়া মুবাহ।'' মুস্তাদরাক হাকেমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এই রকমই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তাতে বর্ধিত রয়েছে যে ফজরে (ঊষায়) খাবার খাওয়া হারাম সেই ফজর আকাশের প্রান্তভাগ থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় ফজর নেকড়ে বাঘের লেজের মত হয়ে উপরের দিকে ওঠে যায় (অর্থাৎ খাম্বার মত সম্পূর্ণ সোজা আকাশের দিকে উঠে যায় বলে মনে হয়)।[২]

১২৮। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অন্ধকারেই ফজরের স্বলাত সম্পাদন করতেন।

(ক) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুমিনা মহিলারা ফজর স্বলাতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে শামিল হতেন, অতঃপর স্বলাত শেষে যখন তাঁরা নিজেদের চাদর গায়ে দিয়ে ফিরতেন তখন لَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ ''অন্ধকারের জন্য কেউ তাদেরকে চিনতে পারতেন না''।[৩]

(খ) জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে — كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ এবং ফজরের স্বলাত নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অন্ধকারেই পড়তেন''।[৪]

১। মুসলিম ৬১৪, কিতাবুল মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত ঃ বাবু আওকাতিস স্বলাওয়াতিল খামসে, নাসায়ী ৫২৩, আবূ দাউদ ৩৯৫।

২। সহীহ্ ঃ আস্ সহীহা ৬৯৩, হাকিম ১/১৯১, ইবনু খুযাইমা ৩৫৬, ইমাম হাকিম এবং ইমাম যাহাবী ও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

৩। মুআত্তা ১/৫, কিতাবু উকূতিস স্বলাত ঃ বাবু উকূতিস স্বলাত, বুখারী ৫৭৮, মুসলিম ৬৪৫, আবূ দাউদ ৪২৩, নাসায়ী ৫৪৫, তিরমিযী ১৫৩, ইবনু মাজাহ্ ৬৬৯, হুমাইদী ১৭৪, আহমাদ ৬/২৫৮, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩৭০, বাইহাক্বী ২/১৯২।

৪। বুখারী ৫৬৫ - কিতাবু মাওয়াকিতিস স্বলাত ঃ বাবু ওয়াক্তিল ইশা ইয়াজ তামাআন নাসু আও তাআখখারু, মুসলিম ২৪৬, আবূ দাউদ ৩৯৭, নাসায়ী ১/২৬৪, আহমাদ ৩/৩৬৯।

নিচের হাদীসগুলি উপরোল্লিখিত হাদীসগুলির পরিপন্থী মনে হয় ঃ—

রাফে' বিন খাদিজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — أصبحوا بالصبح فانه اَعْظَمُ لاجوركم "ফজরের স্বলাত ঊষার অন্ধকার পরিষ্কার করে পড়, এতে তোমাদের সওয়াব বেশি হবে"।৫

উভয় ধরণের হাদীসগুলির মধ্যে দু রকমভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়েছে ঃ—

(ক) (ইবনু কাইইম রহঃ, তাহাবী রহঃ) - ফজরের স্বলাত ঊষার অন্ধকারে শুরু করতে হবে এবং ক্বিরাত এতটা দীর্ঘ করতে হবে যেন ঊষার অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে যায়।

(খ) (শাফেয়ী, আহমাদ রহঃ) - أصبحوا বা اسفروا এর অর্থ হল ফজর স্পষ্ট হওয়াতে যেন কোনো রকম সন্দেহ না থাকে।৬

প্রকাশ থাকে যে, ঊষার অন্ধকার পরিষ্কার করে যদিও ফজরের স্বলাত সম্পাদন করা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে, তবুও শেষে সারা জীবন যে আমলের উপর অবিচল ছিলেন, তা হল গালাস বা ঊষার অন্ধকারে স্বলাত আদায় করতেন। যেমন আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফজরের স্বলাত একবার অন্ধকারে পড়েছিলেন এবং দ্বিতীয়বার অন্ধকার পরিষ্কার করে পড়েছিলেন।

ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات و لم يعد الى ان يسفر.

অতঃপর আমৃত্যু নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ফজরের স্বলাত অন্ধকারেই সম্পাদিত হত। দ্বিতীয়বার কখনো তিনি পরিষ্কারে ফজরের স্বলাত পড়েন নি।৭

এ বিষয়েও ওলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে ঃ—

(মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ রহঃ) - ফজরের স্বলাত অন্ধকারে সম্পাদন করা উত্তম এবং মুস্তাহাব — ইমাম ইসহাক, ইমাম আবূ সওর, ইমাম আওযায়ী, ইমাম দাউদ রাহেমাহুমুল্লাহ্ আজমাঈন এবং এভাবে আবূ বাকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনু যুবায়ের, আনাস, আবূ মূসা এবং আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

(আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ, আবূ ইউসুফ রহঃ) - ফজরের স্বলাত পরিষ্কারে পড়া উত্তম। এঁদের দলীল হল সেই হাদীস যাতে اصبحوا بالصبح (পরিষ্কারে ফজরের স্বলাত পড়) শব্দ রয়েছে।৮

তুলনামূলক বেশি সঠিক ঃ অন্ধকারে ফজরের স্বলাত সম্পাদন করাই উত্তম কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপরই বরাবর আমল করতেন। চার খলিফা, জমহুর ওলামা, সাহাবা এবং তাবেঈনদের এটাই ছিল মত। এ কথাও স্মরণে রাখা দরকার যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেবল আফযাল বা উত্তম আমলই পছন্দ করতেন।৯

৫। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৪১৯, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু ফী ওয়াক্তিস সুবহে আবূ দাউদ ৪২৪, তিরমিযী ১৫৪, নাসায়ী ১/২৭২, ইবনু মাজাহ্ ৬৭২, আহমাদ ৩/৪৬৫, দারেমি ১/২৭৭।

৬। এ'লামুল মুকিইন ২/২৯০, আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/২০৩, নাইলুল আওতার ১/৪৭৭, তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৫০৫, তিরমিযী ঃ কিতাবুত্ ত্বাহারাত ঃ বাবু মা জাআ ফিল ইসফার বিল ফাজরে।

৭। হাসান ঃ সহীহ্ বূ দাউদ ৩৭৮, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুন ফিল মাওয়াকিত ঃ আবূ দাউদ ৩৯৪, ইবনু খুজাইমা ৩৫২, মুআত্তা ২৯, আহমাদ ৪/১২০, দারেমী ১১৮৯, বুখারী ৫২১, মুসলিম ৬১০।

৮। তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১/৪৯৮, নাইলুল আওতার ১/৪৭৭, আল্ লুবাব ১/৬০, আল্ কাওয়ানিলুল ফিকহিয়্যা পৃঃ ৪৫, আশ্ শারহুস সাগীর ২২২।

৯। আল্ ই'তেবার লিল হাযেমী পৃঃ ২৬৮-২৭৫।

(ইবনু কুদামা রহঃ) - ফজরের স্বলাত অন্ধকারে সম্পাদন করাই আফযাল বা উত্তম।১০

(ইবনু হাজার রহঃ) - এ কথাই বলেছেন।১১

(আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহঃ) - এ কথাই বলেছেন।১২

২। আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

وَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. "ফজরের স্বলাত সূর্যোদয় পর্যন্ত পড়া যায়"।১৩

যে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা স্বলাত পড়তেই ভুলে গেল, যখন মনে পড়বে তখনই তার স্বলাতের সময় ১	مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ اَوْسَهَا عَنْهَا فَوَقْتُهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا.

১ (ক) আবু কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْنَامَ عَنْهُا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا. তোমাদের কেউ স্বলাত পড়তে ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে গেলে যখন মনে পড়বে, তখন স্বলাত সম্পাদন করবে।১৪

(খ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ---

مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ. যে ব্যক্তি স্বলাত পড়তে ভুলে যাবে, যখন তার স্মরণে আসবে তখনই সে স্বলাত পড়বে, কেবল এটাই তার কাফ্ফারা।১৫

(গ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে স্বলাত পড়তে ভুলে যাবে, যখন মনে পড়বে, তখন সে যেন স্বলাত পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ---

اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ : طه - ١٤ স্বলাত তখন কায়েম কর, যখন আমাকে মনে পড়বে।১৬

এ হাদীসগুলির বিপরীত অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, জেনেশুনে স্বলাত পরিত্যাগকারী স্বলাত কাযা করবে না। কেননা প্রমাণিত নিয়ম হল এই যে — اِنْتِفَاءُ الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ اِنْتِفَاءُ الْمَشْرُوْطِ. শর্ত না পাওয়া মাশরুতের (অর্থাৎ যার সঙ্গে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার) না পাওয়াকে অপরিহার্য করে দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি না ভুলে (ইচ্ছাকৃত) স্বলাত পরিত্যাগ করবে, সে কাযা হিসাবে স্বলাত সম্পাদন করবে না। ইমাম ইবনু হাযম এ মতকেই সমর্থন করেছেন।

এ থেকে এটাও জানা গেল যে, ঘুমন্ত বা ভুলকারী ব্যক্তির যখনই স্বলাতের কথা স্মরণে আসবে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে তার স্বলাত সম্পাদন করে নেওয়া উচিত। কেননা তার স্বলাত সম্পাদনের সময় সেটাই এবং এটা বোঝা গেল যে, এই দুই অবস্থায় মানুষ স্বলাত আদায়ের জন্য বাধ্য নয়। ইজমা থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়।১৭

(১০) আল্ মুগনী ১/৪৪। (১১) কাযা ফী তুহফাতিল আহ্ওয়াযী ১/৫০৩। (১২) প্রাগুক্ত ১/৫০৫। (১৩) মুসলিম ৬১২, আহমাদ ২/২১০, আবূ দাউদ ৩৯৬, শারহু মাআনিল আসার ১/৫০, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩৭১। (১৪) মুসলিম ৬৮১, কিতাবুল মাসাজিদ অ মাওয়াযেউস স্বলাত ঃ বাবু কাযাইস স্বলাতিল ফায়েতাহ্, আবূ দাউদ ৪৩৮, নাসায়ী ১/২৯৪, তিরিমযী ১৭৭, ইবনু মাজাহ্ ৬৯৮, আহমাদ ৫/২৯৮, ইবনু খুযাইমাহ ২/৯৫, ইবনুল জারুদ ১৫৩, দারাকুতনী ১/৩৮৬। (১৫) আহমাদ ৩/২৬৯, বুখারী ৫৯৭, কিতাবু মাওয়াকীতিস স্বলাত ঃ বাবু মান নাসিয়া স্বলাতান ফাল ইউসাল্লি ইযা যাকারা .. মুসলিম ৬৮৪, তিরমিযী ১৭৮, ইবনু মাজাহ্ ৬৯৯, নাসায়ী ১/২৯৩, আবূ দাউদ ৪৪২, আবূ আওয়ানাহ্ ১/৩৮৫, দারেমী ১/২৮০, ইবনু খুজাইমা ৯৯৩, বাইহাক্বী ২/২১৮। (১৬) মুসলিম ৬৮০, কিতাবুল মাসাজিদ ... আবূ দাউদ ৪৩৫, নাসায়ী ১/২৯৬, ইবনু মাজাহ্ ৬৯৭, আবূ আওয়ানাহ্ ২/২৫৩, বাইহাক্বী ২/২১৭। (১৭) নাইলুল আওতার ১/৪৮৬-৪৮৮।

৪র্থ পর্ব

কাফ্ফারার বিধান

মুসলেহুদ্দীন বুখারী

পঞ্চম অধ্যায়

রমযান মাসে সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের কাফ্ফারা

১। মসলা ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের দিনে স্ত্রী সহবাস করে সিয়াম নষ্ট করে তার কাফ্ফারা।

যে ব্যক্তি রমযান মাসের দিনে স্ত্রী সহবাস করে সিয়াম নষ্ট করে তার কাফ্ফারা হল তাকে একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে, এতে অসমর্থ হলে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম রাখতে হবে। যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। তাতেও অক্ষম হলে মাফ পেয়ে যাবে। তার প্রমাণ হল —

عن أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَ أَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ ، أُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ، قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا، قَالَ : خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا ـ يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ''ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?' লোকটি বলল, 'সিয়াম অবস্থায় আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি।' রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, 'তুমি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে পারবে?' লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, 'একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম রাখতে পারবে?' সে বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ষাট জন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে পারবে?' সে বলল, 'জী না।' বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চুপ হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এলো। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়?' সে বলল, 'প্রশ্নকারী আমি।' তিনি বললেন, 'এইগুলি নিয়ে যাও ও স্বাদকা করে দাও।' সে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার থেকে অধিক গরীব পরিবারে কি? আল্লাহ্র কসম অত্র এলাকায় আমার পরিবার থেকে অধিক গরীব পরিবার আর কেউ নেই।' নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হেসে উঠলেন, এমনকী তাঁর চোয়ালের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর বললেন, 'তোমার পরিবারকে খাইয়ে দাও' (বুখারী, মুসলিম, শারহ উমদাতুল আহকাম ৩০ খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)।

২। মসলা ঃ এই কাফ্ফারা শুধু সেই ব্যক্তিদেরকে আদায় করতে হবে, যারা রমাযান মাসের সিয়াম অবস্থা স্ত্রী সহবাস করবে। এছাড়া মানতের সিয়াম বা নফল সিয়াম ইত্যাদিতে সহবাস করলে সহীহ্ মত অনুযায়ী কোনো কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তবে গোনাহ্গার হবে। কারণ কাফ্ফারার বর্ণনা শুধু রমযান মাসের জন্য এসেছে।

জ্ঞাতব্য যে, রমযান মাসে দিনে সিয়াম অবস্থায় সঙ্গম ছাড়া অন্য কোনো কারণে বীর্যপাত করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

৩। মসলা ঃ যদি কেউ রমযানের সিয়াম অবস্থায় যোনিপথ ছাড়া অন্যত্র সহবাস করে এবং বীর্যপাত করে, তবে কি তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ সহীহ্ মত অনুযায়ী যোনিপথ ছাড়া বীর্যপাত করাতে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, তবে সে সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে পাপী হবে। তাকে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করতে

হবে এবং সেই সিয়াম কাযা করতে হবে (মিরআতুল মাফাতীহ্)।

৪। মসলা ঃ স্ত্রীর উপরও কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ যদি স্ত্রী এর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, সহবাসে রাজি থাকে এবং সিয়াম স্মরণ থাকে, তবে তার উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয়তঃ যদি সে এর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞাত হয় বা সে যে সিয়াম আছে তা ভুলে গিয়ে থাকে অথবা স্বামী জোরপূর্বক সহবাস করে থাকে, তবে স্ত্রীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তাকে অবশ্যই সিয়াম কাযা করতে হবে (ইশা'রাত ফী আহকামিল কাফ্ফারাত ৮৭ পৃঃ)।

৫। মসলা ঃ যদি কোনো ব্যক্তি রমাযান মাসে সিয়াম অবস্থায় সহবাস করা হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়, কিন্তু তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞ হয় তবুও তাকে কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব।

আর যদি কেউ সহবাস করার পর কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে পুনরায় সহবাস করে, তবুও একবার কাফ্ফারা আদায় করলেই চলবে। কারণ প্রথম সহবাসেই তার সিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ রমযানের কাযা সিয়াম রাখতে গিয়ে স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে, তাহলে তার ফলে কাফ্ফারা নেই। আর তার জন্য ঐ দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও জরুরী নয়। অবশ্য তার গোনাহ্ হবে। কারণ, সে ইচ্ছাকৃত একটি সিয়াম নষ্ট করে তাই (রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ৭৮ পৃঃ)।

৬। মসলা ঃ মুসাফির যদি সফরে থাকা অবস্থায় সিয়াম রেখে স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে, তাহলে তার জন্য কেবল কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। ঐ দিনে বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও তার জন্য জরুরী নয়। কেননা সে মুসাফির। আর মুসাফিরের জন্য সফরে সিয়াম ভঙ্গ (এবং পরে কাযা করা) বৈধ (রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ৭৮ পৃঃ)।

৭। মসলা ঃ যদি কোনো ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় সিয়াম রেখে স্ত্রী-সহবাস করার পর দিন থাকতেই এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাতে তার জন্য সিয়াম ভাঙ্গা বৈধ, তাহলেও তার জন্য কাফ্ফারা ওয়াদিব; যদিও তার জন্য দিনের শেষভাগে (অসুস্থ হওয়ার পর) সিয়াম ভঙ্গ বৈধ। কারণ সহবাসের সময় সে তাতে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল না।

তদনুরূপ যদি কোনো ব্যক্তি দিনের প্রথমাংশে সহবাস করার পর সফর করে, তাহলে তার জন্যও কাফ্ফারা ওয়াজিব; যদিও সফর করার পরে ঐ দিনেই তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। কেননা, সিয়াম ভাঙ্গা বৈধ হওয়ার পূর্বেই সে (রমাযান) মাসের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে (ইশা'রাত ফী আহকামিল কাফ্ফারাত ৮৯ পৃঃ)।

সিয়াম না রাখার কাফ্ফারা

১। মসলা ঃ গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাতা যদি রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করে, তবে কি তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ যদি তার ব্যক্তিগত শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশংকায় সিয়াম ভঙ্গ করে, বাচ্চাদের ক্ষতির আশংকায় নয়, তবে তাদের উভয়কে সিয়াম কাযা করতে হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি তারা সন্তানের ক্ষতি হবে ভেবে সিয়াম ভঙ্গ করে, তবে সিয়াম কাযা করতে হবে ও কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে, এটাই উলামাদের সঠিক মত (আস্ সিয়াম আহকাম ও আ-দাব ৯৩)। *এ ফাত্ওয়া সম্বন্ধে আমরা একমত নই। কারণ সন্তানের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা করলে দুধদানকারিনী মাতা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং শুধুমাত্র ভাঙা সিয়াম পরবর্তীতে কাযা করবে, কাফ্ফারা লাগবে না ফাত্ওয়া লাজনাহ্ দাইমাহ্) — সম্পাদনা পরিষদ।*

২। মসলা ঃ এমন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সিয়াম রাখতে অক্ষম, তাদেরকেও কি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ তারা সিয়াম রাখবে না। তবে তাদেরকেও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তাদের কাফ্ফারা হল, প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করা। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

অর্থ ঃ যারা সিয়াম রাখার সামর্থ্য থাকা সত্বেও সিয়াম রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ১৮৪)।

এই আয়াতটির হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। তবে এর হুকুম

অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বহাল আছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সম্পর্কে বলতেন, যারা সিয়াম রাখতে সক্ষম নয়, তারা প্রতি দিনের পরিবর্তে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে (বুখারী, তাফসীরুল কুরআন লিল উসাইমীন চতুর্থ খণ্ড ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

অবশ্য এমন বৃদ্ধ, যার কোনো জ্ঞানই নেই, তার জন্য এবং তার পরিবারের জন্য কোনো কিছু ফরয নয়। তার তরফ থেকে সিয়াম রাখতে বা কাযা করতে হবে না এবং মিসকীনও খাওয়াতে হবে না। কারণ, শরীয়তের সকল ভার তার পক্ষে মাফ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি এমন বৃদ্ধ হয়, যার কখনো কখনো জ্ঞান থাকে এবং সে ভালো-মন্দের তামীয করতে পারে, আবার কখনো কখনো আবোল-তাবোল বকে, তাহলে যে সময় সে ভালো থাকে, সেই সময় তার জন্য সিয়াম বা খাদ্য দান ফরয এবং যে সময় তমীয-জ্ঞান থাকবে না, সে সময় ফরয নয় (রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল ৩৪ পৃঃ)।

৩। মসলা ঃ গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাতা ও বৃদ্ধ এবং তাদের মত যারা তাদের কাফ্ফারা কত এবং তা কীভাবে বের করবে?

উত্তর ঃ তাদের কাফ্ফারার পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন — فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. অর্থ ঃ একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত নং ১৮৪)।

অতএব নিজ নিজ এলাকার প্রসিদ্ধ যে কোনো খাদ্যের অর্ধ সা' (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) খাবার দান করতে হবে।

খাদ্য দানের নিয়ম

মিসকীনকে খাদ্য দানের ২টি নিয়ম আছে ঃ

প্রথম এই যে, দেশের প্রধান খাদ্য থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকীনকে মোটামুটি সওয়া এক কিলো করে খাদ্য দান করবে।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, এক দিন খাবার তৈরি করে সিয়াম সংখ্যা হিসাবে মিসকীন ডেকে খাইয়ে দেবে (অথবা একজন মিসকীনকেই ঐ পরিমাণ দিনের খাবার দেবে) (ইশা'রাত ফী আহকামিল কাফ্ফারাত ৯৩ পৃঃ)।

৪। মসলা ঃ এমন চিররোগী, যার রোগ ভাল হওয়ার কোনো আশা নেই; যেমন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগী। এমন রোগা ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যে সে বা তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে (আস্সিয়াম আহকাম ও আ-দাব ৯৩ পৃঃ)।

৫। মসলা ঃ আগামী রমযান পর্যন্ত কাযা সিয়াম পূর্ণ করতে না পারলে তার বিধান।

কোনো শারয়ী ওযরের (যেমন অসুস্থ, সফর ইত্যাদি) কারণে কাযা সিয়াম পালন না করা অবস্থায় দ্বিতীয় রমযান এসে উপস্থিত হলে প্রথমে বর্তমান রমযানের সিয়াম পালন করতে হবে। তারপর ঐ কাযা সিয়াম রেখে নিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে তার জন্য কোন্ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে বিনা ওযরে কাযা সিয়াম পূর্ণ না করে পরবর্তী রমযান পার করা বৈধ নয়। কেউ পার করে দিলে গোনাহগার হবে এবং পরে কাযা করার সাথে সাথে তাকে প্রত্যেক সিয়ামের বিনিময়ে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে (আস্ সিয়াম আহকাম ও আ-দাব)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাসিক অবস্থায় সহবাস করার কাফ্ফারা

মাসিক অবস্থায় সহবাস করা সর্বসম্মত হারাম। মহান আল্লাহ বলেন —

وَ يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَـأْتُـوْهُـنَّ مِـنْ حَيْـثُ اَمَـرَكُـمُ اللّٰـهُ اِنَّ اللّٰـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ ঃ ওরা তোমাকে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। (সহবাসের জন্য) তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন তারা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদেরকে এবং যারা পবিত্র তাদেরকে ভালোবাসেন (সূরা আল্ বাক্বারাহ্, ২/২২২)।

মাসিকাবস্থায় সহবাস করা হারাম। কেউ মাসিকাবস্থায়

সহবাস করে ফেললে সে গোনাহগার হবে এবং তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা মুস্তাহাব। আর তা হল কিছু ওলামায়ের মতে হায়েয আসার প্রথম দিকে হলে এক দীনার (সাড়ে তিন গ্রাম সোনা বা তার মূল্য) আর শেষের দিকে হলে অর্ধ দীনার সাদকা করা। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মাসিকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তার সম্পর্কে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার সাদকা করবে'' (আবূ দাউদ, নাসাঈ)।

এক দীনার ব অর্ধ দীনার সাদকা করার ব্যাপারে ইখ্তিয়ার থাকবে। যে কোনো একটা আদায় করে দিলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (আল্ মুগনী ১/৪১৮ পৃঃ)।

আর যদি কেউ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করার পূর্বেই সহবাস করে ফেলে, তবে সহীহ্ মত অনুযায়ী তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কেননা যে অশুচিতার কারণে সহবাস নিষিদ্ধ ছিল, তা ঋতু বন্ধ হওয়ার কারণে দূর হয়ে গেছে। আর কাফ্ফারা তখনই দিতে হবে, যখন মাসিকাবস্থায় সহবাস হবে, অন্য সময় নয় (আল্ মুগনী ১/৪১৮ পৃঃ)।

অবশ্য যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য স্ত্রী অন্তর্বাস পরে লজ্জাস্থান (প্রস্রাব ও পায়খানা দ্বার) পর্দা করে অন্যান্য স্থানে বীর্যপাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার যৌনাচার বৈধ। যেমন বুখারীতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, (মাসিকাবস্থায়) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে লেঙ্গুটি বাঁধার আদেশ করতেন। অতঃপর আমার সঙ্গে মিলা-মেশা করতেন (মুখতাসার বুখারী ২০৮)।

অনুরূপ হাঁটুর নিচে ও নাভীর উপরে কোনো পর্দা ছাড়াও যৌনাচার করে বীর্যপাত করা বৈধ (আল্ মুগনী ১/৪১৪ পৃঃ)।

যেমন, পায়ু ও যোনিপথে সঙ্গম করার আশঙ্কা না থাকলে বা ধৈর্য রাখতে পারলে স্ত্রীর উরু-মৈথুনও বৈধ। কারণ আল্লাহ্ তাআলা হায়েযের স্থান (যোনিপথে) সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন। আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনাচার করতে পার'' (মুসলিম)। তবে ধৈর্য রাখতে না পারলে তার জন্য বৈধ নয়।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, যখন আমরা (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম-এর স্ত্রীরা) হায়েয অবস্থায় থাকতাম এবং তিনি মিলা-মেশা করতে চাইলে আমাদেরকে ন্যাকড়া বেঁধে নেওয়ার আদেশ করতেন, তারপর মিলা-মেশা করতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ন্যায় দৃঢ় সংযমী আর কে হতে পারে?'' (মুখতাসার বুখারী ১০৯)।

মাসিকাবস্থায় সহবাস হওয়াতে যদি স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে, তবে স্ত্রীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রীর ইচ্ছার বিপরীত জোরপূর্বক সহবাস হয়, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না (আল্ মুগনী ১/৪১৯ পৃঃ)।

জ্ঞাতব্য যে, হায়েযা নারী ও নেফাসওয়ালী নারীর বিধান একই (আল্ মুগনী ১/৪১৯ পৃ)।

রমাযানের সিয়ামের গুরুত্ব ও তার ফযিলত

আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম

ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে রমাযান মাসের সিয়াম পালন। সিয়াম বাৎসরিক কর্তব্য যা বছরে একবার করে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। রমাযানের সিয়াম পালন সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১। সিয়াম পালনের বিধান ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন—يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল যাতে তোমরা সংযমী হতে পার (সূরা বাক্বারাহ্ ১৮৩ নং আয়াত)।

অত্র আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উম্মাতের উপর এক মাস সিয়াম ফরয হবার পূর্বে অন্যান্য নাবীদের উম্মাতের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছিল, যেমন আমাদের উপর এক মাস সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে জাহেলী আরবদের মধ্যেও সিয়াম ছিল। তারাও সিয়াম পালন করত এবং তাদের এই সিয়াম মুসলিমরাও পালন করত। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আশুরার দিনে

কুরাইশরা জাহেলী যুগে সিয়াম রাখতো এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জাহেলী যুগে ঐ সিয়াম রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় আসেন তখনও ঐ সিয়াম নিজে রাখেন এবং সাহাবীদেরকে সিয়াম রাখার হুকুম দেন। পরিশেষে রমাযানের সিয়াম যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেন (বুখারী ১ম খণ্ড হাদীস নং ১৪৯৭)।

২। সিয়ামের গুরুত্ব ঃ ইসলামে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শরীআতী ওযর ছাড়া এই মাসের একটি সওম ছেড়ে দেবে সে যদি সারা জীবন সিয়াম রাখে তবুও তার পাপের খেসারত হবে না। ইমাম বুখারী 'রমাযানে যদি সহবাস করে ফেলে' নামক অধ্যায়ে আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অত্র হাদীসটি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি রমাযানের একটি সিয়াম অকারণে ছেড়ে দেবে সে যদি জীবন ভোর সিয়াম পালন করে তবুও তার ঐ ছেড়ে দেওয়া সিয়ামের পাপের খেসারত হবে না। কাজেই শরীআতী ওযর ছাড়া সিয়াম পরিত্যাগ করা কাবীরা গুনাহ্। মহান আল্লাহ্ বলেন **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি (রমাযান) কে পাবে সে যেন এ মাসের সিয়াম পালন করে (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৫)।

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসগুলি থেকে বোঝা যায় যে রমাযান মাসের সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অতএব সিয়ামের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে আবশ্যিক হিসাবে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। সিয়াম পরিত্যাগ করা কোনো ঈমানদারের জন্য সমীচীন নয়। সিয়াম পালন করা ঈমানদারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৩। রমাযান মাসের ফযীলত ঃ রমাযান মাস একটি ফযীলতের মাস। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই মাসে জীবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে আসতেন এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শ্রবণ করতেন (বুখারী হাদীস নং ১৮৮১)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় পবিত্র রমাযান মাসে উমরা পালনা করা সওয়াবের দিক থেকে হজ্জের সমতুল্য (বুখারী হাদীস নং ১৭৮২, মুসলিম হাদীস নং ১২৫৬, মিশকাত হাদীস নং ২৫০৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যখন রমাযান মাস উপস্থিত হয়ে যায় তখন আসমানের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, জান্নাতের দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদেরকে আটক করে রাখা হয়। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রহমতের দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া (বুখারী হাদীস নং ১৮৯৯, মুসলিম হাদীস নং ১০৭৯,হাদীসের শব্দ মিশকাত থেকে গৃহীত হাদীস নং ১৯৫৬)।

অত্র হাদীসটির মধ্যে রমাযান মাসের ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রমাযান মাস মুমিনদের জন্য একটি সম্মানীয় মাস এবং পাপ মোচনের মাস অন্য মাসের ইবাদাত পালনের চাইতে এই মাসের ইবাদাত পালনের সওয়াবও অনেক বেশি। তাহলে এই মাসের বিশেষভাবে ফযীলত রয়েছে। এই পবিত্র মাসে সিয়াম পালন করা ছাড়াও অন্যান্য নফল ইবাদাত করারও আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সুযোগ দান করেন — আমীন।

৪। রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত ঃ রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমাযান মাসের সিয়াম রাখে তার পূর্বের সমুদয় গুনাহ (সাগীরা) মাফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমাযানের রাতে ইবাদাতে কাটাবে তারও পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাত ইবাদাতে কাটাবে তারও পূর্বকৃত সমুদয় গুনাহ মাফ করা হবে (বুখারী হাদীস নং ১৯০১, মুসলিম হাদীস নং ৭৬০, শব্দ বিন্যাস মিশকাত থেকে গৃহীত হাদীস নং ১৯৫৮)।

হাদীসটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রমাযান মাসের যেমন ফযীলত রয়েছে তেমনিভাবে এ মাসের ইবাদাতেরও ফযীলত রয়েছে। তাই এই মাসে সিয়াম পালনকারীর সমস্ত (সাগীরা) গুনাহ্গুলিকে আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন। আর কাবীরা গুনাহের জন্য আল্লাহ্র দরবারে খালেস তওবা করতে হবে। তাহলে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৫। সিয়াম পালনের পারলৌকিক উপকার ঃ— পার্থিব জগতে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পারলৌকিক শান্তির আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করলে পরকালে তার জন্য অবশ্যই উপকার আছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا : بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ".

সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। ঐ দরজা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবেন (বুখারী, হাদীস নং ৩২৫৭, মুসলিম হাদীস নং ১১৫২, ইবনে মাজাহ্ ১৬৪০, মিশকাত হাদীস নং ১৯৫৭)।

এখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সিয়াম পালনকারীর পারলৌকিক উপকারের কথা বলেছেন যে, সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ্ তাআলা রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন, কিন্তু শুধু এটাই শেষ নয় বরং সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ্ তার ইচ্ছামত প্রতিদান দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হতে সাত শ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেন, কিন্তু সিয়াম এর ব্যতিক্রম। কেননা, সিয়াম একমাত্র আমার জন্য রাখা হয় আর আমিই এর প্রতিদান দেব (আমার যত ইচ্ছা)। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিহার করে থাকে। আর সিয়াম পালনকারীদের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, — একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি (পরকালে) তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তাআলর নিকট মেশকের সুগন্ধি হতেও অধিক সুগন্ধময়। সিয়াম হলো ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও সিয়ামের দিন আসে সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবেনা এবং গণ্ডগোল করবেনা। তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে অথবা লড়াই করতে চায় তবে সে যেন বলে আমি একজন সায়েম (বুখারী হাদীস নং ১৯০৪, মুসলিম হাদীস নং ১১৫১, মিশকাত হাদীস নং ১৯৫৯)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এখানে সিয়ামকে ঢাল বলেছেন। ঢাল এর অর্থ হলো পর্দা, প্রতিরক্ষা, হাতিয়ার, প্রতিরোধক ইত্যাদি।

সার কথা হচ্ছে যে, সিয়াম সিয়ামপালনকারীর জন্য ঢাল স্বরূপ যা ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্য ঢালের মত কাজ করবে। যেমন মোল্লা আলী কারী বলেন, "اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সিয়াম, সিয়াম পালনকারীর জন্য পার্থিব জীবনে অন্যায় থেকে এবং পরকালীন জগতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ" (বাংলা মিশকাত ২৯২ পৃঃ)।

৬। সাহারী ঃ নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةٌ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সাহারী খাও। কারণ সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে (বুখারী হাদীস নং ১৯২৩, মুসলিম হাদীস নং ১০৯০, মিশকাত হাদীস নং ১৯৮২)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি আরো বলেন —

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

আমর ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও আমাদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্যই হল সাহারী খাওয়া (মুসলিম হাদীস নং ১০৯৬, মিশকাত হাদীস নং ১৯৮৩)।

এই দুটি হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা সাহারী না খেয়ে সিয়াম রাখে তাদের সিয়াম এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের সিয়ামের

মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং সাহারী খাওয়া থেকে বিরত থাকলে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং যারা সিয়াম রাখেন তাদেরকে অল্প হলেও সাহারী খেতে হবে। ইচ্ছাকৃত সাহারী না খাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ঘুম থেকে জাগতে না পারে অথবা সাহারী খাওয়ার সময় না পায়, তবে এমন ব্যক্তি সাহারী না খেয়েই সওম পালন করবে। প্রকাশ থাকে যে, সওম শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহারী খাওয়া শর্ত নয়।

৭। ইফতার ঃ ইফতার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

عَنْ سَهْلٍ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে'' (বুখারী হাদীস নং ৯৫৭, মুসলিম হাদীস নং ১০৯৮, মিশকাত হাদীস নং ১৯৮৪)।

আমর বিন মায়মুন আওদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সহচরবৃন্দ তথা সাহাবীগণ ইফতার তাড়াতাড়ি করতেন এবং সাহারী দেরিতে খেতেন (সহীহ্ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, হাদীস নং ৭৫৯১, হাফেয ইবনু হাজার আস্কালানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, ফাতহুল বারী ৪/৭১৩)।

উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ইফতারে দেরি করা মোটেই উচিৎ নয়। যদি কেউ ইফতারে দেরি করে তাহলে সে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ফরমান অনুযায়ী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইহুদী ও নাসারাদের কাজ করবে আর আল্লাহ্র নিকট অপ্রিয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ — হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকল দ্বীনি ভাইকে রমাযান মাসের সিয়াম পালন করার তাওফীক দান কর এবং তা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পদ্ধতিতে পালন করার তাওফীক ইনায়াত করো — আমীন।

ঈদুল ফিত্র

মুস্তাফীযুর রহমান

আধুনিক যুগে উৎসব মানেই অপসংস্কৃতি, নিলর্জ্জতা, বেহায়াপনা, গানবাজনা, উদ্দাম নৃত্য, সিনেমা প্রদর্শনী, শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের সমাহার। ইসলাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্ম দুটি দিনকে (ঈদুল ফিত্র এবং ঈদুল আযহা) উৎসব স্বীকৃতি দিয়েছে, যা অন্যান্য জাতি বা ধর্মের উৎসবসমূহ হতে ভিন্ন। এই উৎসবের দিন হচ্ছে খোদাভীতি ও তাক্বওয়া অবলম্বন করার দিন তথা পরম করুণাময়ের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির দিন। এই দিন মুমিনের সাফল্য লাভ করার দিন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَ ذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

অর্থ ঃ নিষচয় সে সাফল্য লাভ করে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও স্বলাত আদায় করে (সূরা আ'লা, আয়াত ১৪-১৫)।

আভিধানিক অর্থ ঃ عيد শব্দের আভিধানিক অর্থ বার বার ফিরে আসা, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিনটি যেহেতু প্রতি বছর ফিরে আসে তাই এর নামকরণ সার্থক হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ১১৪ নং আয়াতে ঈদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ .

অর্থ ঃ মারয়্যাম পুত্র ঈসা বললেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন ও আনন্দোৎসব স্বরূপ। তুমি আমাদের জীবিকা দাও। তুমিই উত্তম জীবিকাদাতা।

ঈদ শব্দটি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মুখেও উচ্চারিত হয়েছে। অতএব এটা নিছক আনন্দোৎসব নয় এটা শারয়ী বিধানও বটে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তিনি দেখলেন এখানকার অধিবাসীরা দুটি দিনে আনন্দ, উৎসবে মুখর হয়ে উঠছে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন —''এই দুটি দিন কেমন? তাঁরা বললেন, আমরা জাহেলীয়াতের যুগে এই দিনগুলিকে খেলাধূলা বা স্ফূর্তি, আনন্দ করতাম। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এই দুটি দিনের পরিবর্তে অন্য দুটি দিন দিয়েছেন সেটা হল কুরবানীর দিন এবং ফিত্‌রের দিন'' (আবু দাউদ)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, ঈদুল ফিত্‌র দ্বিতীয় হিজরীতে মাশরু বা বিধানে পরিণত হয়েছিল।

নারী সমাজ ও ঈদ ঃ বর্তমান মিডিয়ার বেশির ভাগ অংশ প্রচার চালায় যে, ইসলাম নারীদের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, কিংবা নারীদের আবদ্ধ করে দিয়ে তাদের উন্নয়নের পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এর থেকে ভিন্নতর। পরম করুণাময় যেমন পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে গড়ে তোলার জন্য নারী পুরুষের উভয়ের অধিকারের খেয়াল রেখেছেন সেরকম তাদের পরকালের মুক্তির জন্য নেকী করার অধিকার উভয়কেই সমভাবে প্রদান করেছেন। স্বলাত ও সিয়াম থেকে শিক্ষা, তাবলীগ ও দাওয়াত সমস্ত কিছুতেই সমতা বজায় রেখেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ.

অর্থ ঃ অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং (বললেন) আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্ম নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা পরস্পর সম শ্রেণিভুক্ত (সূরা আলে ইমরাণ, আয়াত ১৯৫)।

এবার আশা যাক, ইসলাম মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান তো করেছেই বরঞ্চ আল্লাহ্‌র রসূল এ ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেছেন যা অবশ্যই পালনীয়।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ دَعْوَتَهُمْ وَ تَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ اِمْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

উম্মে আত্বিইয়া (রাযি আল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল আমরা যেন ঋতুবর্তী ও পর্দানাশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই, যেন তারা মুসলিমদের জামাআত ও দুআয় শরীক হতে পারে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'' মুত্তাফাক আলাইহি (বুখারী হাঃ নং ৩৫১, মিশকাত ১ম খণ্ড ১২৫)।

আনন্দোৎসব ও ঈদ ঃ বর্তমানে আমাদের সমাজে ঈদের দিনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বিজাতীয় অনুসরণ ঢুকে পড়েছে। ঈদের সময় অনেক গ্রামে এমনকী আমরা যারা নিজেকে আহ্‌লে হাদীস বলে পরিচয় দিই সে সমস্ত গ্রামেও ঈদের দিনে এমন অনেক কার্যকলাপ দেখা যায় যা দেখে ইহুদী ও খৃষ্টানরা লজ্জা পাবেন। ঈদের দিনে হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করে কোথাও প্যাণ্ডেল করা হয় কোথাও মিনার, তোরণ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতে কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। কোথাও ঈদ উপলক্ষ্যে বসে মীনাবাজার, সার্কাস, নাগরদোলা। যেখানে মুসলিম নামধারী তরুণ তরুণী হাত ধরাধরি করে অংশ গ্রহণ করে। তরুণীরা পর্দার গর্দা উড়িয়ে মেলা তথা সার্কাস প্রাঙ্গনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। শয়তানের হাতছানিতে মুসলিম নামধারী যুবকের হৃদয়ে অনুরণন জেগে ওঠে , মেতে ওঠে আনন্দ ও স্ফূর্তিতে। এ সমস্ত কি ইসলামী শরীআতে বৈধ বলে গণ্য হয়? না তা কক্ষনো না। তবে কি ইসলাম ধর্ম একেবারে গোঁড়া কোনো রস বা আনন্দই এখানে নেই? হ্যাঁ তা আছে তবে মিথ্যার বেসাতী নেই, অকারণ অপচয় নেই, সংস্কৃতির নামে অশ্লীল গানবাজনা নেই। ঈদ দিবসে শালীনতার সহিত আনন্দ স্ফূর্তি ইসলামী গান, পরিবেশন যার মধ্যে কোনো শিরক্ বা বিদ্‌আত যুক্ত কথা নেই তা জায়েয রয়েছে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার নিকট এমতাবস্থায় প্রবেশ করলেন যখন দু-জন আনসারী বালিকা, বুয়াস যুদ্ধের সম্বন্ধে আনসারীদের যে সমস্ত কবিতা বা ছন্দবদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করেন

তার দ্বারা গান গাইছিল এবং তারা দুজন প্রকৃত গায়িকা ছিল না। আবু বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, শয়তানের বাদ্য যন্ত্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর গৃহে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেটি ছিল ঈদের দিন। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, হে আবু বাক্‌র প্রতিটি কওমের ঈদ রয়েছে এবং এটি হচ্ছে আমাদের ঈদ (বুখারী হাঃ নং ৯৫২, বাবু সুন্নাতিল ঈদাইনে লি আহ্‌লিল ইসলাম, মুসলিম হাঃ নং ২০৬১, অধ্যায় — এমন খেলার অনুমতি যাতে অপকর্ম ও গুনাহ্ নেই)।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা হাবশীগণ ঈদ দিবসে মসজিদে অস্ত্র খেলা প্রদর্শন করার নিমিত্তে আসেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর স্কন্ধে আমার মাথা রাখলাম এবং তাঁদের খেলা দেখতে লাগলাম। এমনকী শেষ পর্যন্ত আমিই প্রথম দৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করেছিলাম।

উপরের হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত ঈদ দিবসে শালীনতার সহিত সীমা অতিক্রম না করে আনন্দ উপভোগ করা জায়েয।

ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া ঃ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাবার পূর্বে কিছু সংখ্যক খেজুর না খেয়ে যেতেন না (সহীহ্ বুখারী)।

ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা পরিবর্তন করা ঃ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন ঈদগাহের দিকে যেতেন তখন তিনি যাতায়াতের রাস্তা পরিবর্তন করতেন (বুখারী, মুসলিম)।

ঈদের স্বলাতের তাকবীর ঃ আমর বিন শুয়াইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ঈদুল ফিত্‌রের স্বলাতে অতিরিক্ত তাকবীর প্রথম রাকাআতে সাত ও পরবর্তী রাকাআতে পাঁচ আর উভয়ক্ষেত্রে তাকবীরের পর ক্বিরআত করতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ঈদায়নে কোন সূরাসমূহ পাঠ করা উত্তম ঃ উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু ওয়াক্বিদ লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রে কোন সূরাসমূহ পাঠ করতেন? তিনি বলেন,

"ق — وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ" اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ.

সে দুটি স্বলাতে তিনি ''ক্বাফ ওয়াল কুরআনীল মাজীদ এবং ইক্বতারাবাতিস্ সাআতু ওয়ান্ শাক্বাল ক্বামারু'' পাঠ করতেন।

নুমান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দুই ঈদে ও জুমুআতে ''সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল্ আ'তাকা হাদীসুল গা-শিয়াহ্'' পাঠ করতেন (মুসলিম হাঃ নং ২০২৮)।

যাকাতুল ফিত্‌র ঃ আমাদের সমাজে বহু প্রচলিত ফিত্‌রাহ্ শব্দটি হাদীসের শব্দ নয়। হাদীসে যাকাতুল ফিত্‌র, সাদাকাতুল ফিত্‌র, যাকাতুস্ সওম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যাকাতুল ফিত্‌রের হুকুম ঃ যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ফরয।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অশ্লীল ও অবাঞ্ছিত কাজের ফলে সওমের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যায়, তা হতে সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করার এবং গরীবদের খাবার ব্যবস্থা করার জন্য যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন (বুলুগুল মারাম হাঃ নং ২০৫, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্, হাদীস হাসান)।

কাদের উপর যাকাতুল ফিত্‌র ফরয ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় উম্মাতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক সা* খেজুর, যব ইত্যাদি ফিত্‌রার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮১৫)।

ঈদ হচ্ছে মুসলিম তথা মুমিনদের আনন্দ দিবস, তাক্বওয়া দিবস তথা পুরস্কার প্রাপ্তি দিবস এটা ইসলামী শেয়ার বা ইউনিফর্ম। এ ইসলামী আন্তর্জাতিক দিবসটি আমরা যেন মহাপরাক্রান্ত করুণাময়ের আদেশকে মান্য করতঃ তথা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রদত্ত সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করতঃ মহান আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার লাভ করতে পারি।

সহীহ্ সুন্নার আলোকে হাজ্জ ও উমরাহ্ আদায়ের পদ্ধতি

আন্ওয়ারুল হক ফাইযী

হাজ্জ তিন প্রকার ঃ (১) তামাত্তু, (২) ক্বিরান ও (৩) ইফরাদ।

হাজ্জে তামাত্তু ঃ হাজ্জের মাসে মীকাত থেকে উমরাহ্র ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ সম্পন্ন করে ইহরাম খুলে দেওয়া। অতঃপর ৮ই যুলহাজ্জ তারিখে স্বীয় অবস্থানস্থল হতে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজ্জ সম্পন্ন করাকে হাজ্জে তামাত্তু বলে।

হাজ্জে ক্বিরান ঃ মীকাত থেকে হাজ্জ ও উমরাহ্র একই সাথে ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ আদায় করা এবং ইহরাম না খুলে ঐ অবস্থায় হাজ্জ সম্পন্ন করাকে হাজ্জে ক্বিরান বলে।

হাজ্জে ইফরাদ ঃ মীকাত থেকে কেবলমাত্র হাজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হাজ্জের সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করাকে হাজ্জে ইফরাদ বলে।

এর মধ্যে হাজ্জে তামাত্তুই হল সর্বোত্তম। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি পরে যা জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সাথে না থাকত (তাহলে উমরাহ্ সম্পন্ন করে) অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম''(বুখারী ১৬৫১, ১৭৮৫, আবূ দাউদ ১৭৮৯)। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেবল উত্তমেরই আকাঙ্খা করতেন। শুধু তাই নয়, বরং যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তাদের জন্য হাজ্জে তামাত্তু আবশ্যিক। কেননা বিদায় হাজ্জে যে সকল সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁদের হাজ্জ-এর ইহরামকে উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী ১৫৭২, বাইহাকী ৮৮৮৯)। এমনকী সাহাবীগণ যখন বলেন, ''আমরা তো হাজ-এর নাম নিয়ে ইহরাম বেঁধেছি, কীরূপে এ ইহরামকে আমরা উমরাহ্র ইহরাম বানাব?'' তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করছি তোমরা তাই কর। কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলেছি, আমিও তাই করতাম'' (বুখারী ১৫৬৮, মুসলিম ২১৩৩)। তাই হাজ্জে তামাত্তুর বিবরণ সর্বাগ্রে আলোচনা করবো ইন্শাআল্লাহ্।

উমরাহ্র বিবরণ ঃ এর রুকন ৩টি ঃ (১) ইহরাম বাঁধা, (২) কাবার ত্বাওয়াফ করা ও (৩) সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা। আর ওয়াজিব ২টি ঃ (১) মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা, (২) মাথা মুণ্ডন করা অথবা মাথার সমস্ত চুল ছোট করা। অবশ্য মহিলারা তাদের চুল আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ কেটে ছোট করবে।

হাজ্জ-এর বিবরণ ঃ এর রুকন ৪টি ঃ (১) ইহরাম বাঁধা, (২) আরাফা ময়দানে অবস্থান করা, (৩) ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্ / যিয়ারহ্ করা ও (৪) সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা। আর এর ওয়াজিব ৭টি ঃ (১) মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা, (২) আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা, (৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা, (৪) জামারাতে পাথর মারা, (৫) মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা, (৬) মিনায় রাত্রি বাস করা ও (৭) বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা।

উল্লেখ্য যে, হাজ্জ বা উমরাহ্র কোনো রুকন ছুটে গেলে হাজ্জ বা উমরাহ্ বিনষ্ট হয়ে যায়। আর ওয়াজিব ছুটে গেলে উমরাহ্ বা হাজ্জ হয়ে যাবে, তবে ফিদ্য়্যাহ্ আদায় করা ওয়াজিব।

ফিদয়্যাহ্ ঃ একটি বকরী জবাই করে (দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করবে) অথবা ৬জন মিসকিনকে তিন সা' খাদ্য দিবে অথবা ৪টি সিয়াম পালন করবে (বুখারী ১৮১৬, ৪১৫৯, মুসলিম ২০৮৪)।

হাজ্জে তামাত্তু ঃ অর্থাৎ উমরাহ্ আদায় করে ইহরাম খুলে দেওয়া। অতঃপর ৮ই যুলহাজ্জ হাজ্জের ইহরাম বাঁধা।

উমরাহ্ আদায়ের পদ্ধতি ঃ বিমান যদি মদীনায় যায় তবে বিমানে ইহরামের কাপড় পরিধান করতে হবে না; বরং মদীনা থেকে কাবা অভিমুখে যাত্রাকালে যুল-হুলাইফায় ইহরাম বাঁধবে (বুখারী ১৫২৯)। ইহরামের পূর্বে গোসল ও পুরুষদের জন্য শরীরে সুগন্ধী ব্যবহার করা ভালো (বুখারী ১৫৩৯, তিরমিযী ৮৩০)। অতঃপর ইহরামের কাপড় সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করবে। লুঙ্গী ও চাদর সাদা হওয়া উত্তম। আর মহিলারা যে কোনো কাপড় পরিধান করবে। তবে তা যেন সৌন্দর্য প্রকাশক না হয় এবং পুরুষদের পোষাকের অনুরূপ ও কাফির নারীদের পোষাকের সদৃশ না হয়। অতঃপর ফরয স্বলাতের সময় হলে স্বলাত আদায় করবে। যদি ফরয স্বলাতের সময় না হয় তাহলে এই মহজিদে দু রাকাআত স্বলাত আদায় করবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসাবে, কেননা

ইহরাম বাঁধার জন্য কোনো স্বলাত নেই।

অতঃপর গাড়িতে বসে উমরাহ্‌র ইহরাম বাঁধবে অর্থাৎ মনে মনে উমরাহ্‌র নিয়ত করবে এবং উচ্চস্বরে বলবে লাব্বাইকা উমরাহ্ (মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায ১৭/৭৭)।

অতঃপর উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে —

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وُ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক ল শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক (বুখারী ১৫৪৯, মুসলিম ২০২৯)।

আর বিমান যদি জেদ্দায় অবতরণ করে, তবে বিমান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মীক্বাতের সংকেত পেলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করে লাব্বাইকা উমরাহ্ অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ্ বলে ইহ্‌রাম বাঁধবে। অবশ্য বিমানে চড়ার পূর্বেও ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করা যায়। কারণ মীক্বাতের পূর্বেও ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান প্রমাণিত (বুখারী ১৫৪৫)। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধবে না (অর্থাৎ উমরাহ্‌র নিয়ত করবে না); বরং মীক্বাতে পৌঁছলে অথবা মীক্বাতের নিকটবর্তী হলে ইহ্‌রাম বাঁধবে যদি বিমান আগে বেড়ে যাওয়ার আশংকা করে (হাজ্জাতুন্ নাবী ৪৮ পৃঃ)। অতঃপর তালবিয়া পড়তে থাকবে হাজারে আস্‌ওয়াদকে স্পর্শ করার আগে পর্যন্ত (বাইহাকীর কুবরা ৯৪০৯, ইরওয়াউল গালীল ৪/২৯)। অতঃপর ইযতিবা অর্থাৎ (পুরুষেরা) চাদরের মধ্যভাগকে ডান বগলের নিচে দিয়ে দু পাশকে বাম কাঁধের উপর রাখবে, হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দিবে ও আল্লাহু আকবার বলবে। এরপর প্রথম ৩ চক্করে রমল অর্থাৎ (পুরুষেরা) ছোট ছোট পক্ষক্ষেপে দ্রুত হাঁটবে এবং পরবর্তী ৪ চক্করে স্বাভাবিক ভাবে চলবে (আবূ দাউদ ১৮৮৯, ১৮৯০, বাইহাকীর কুবরা ৯২৪৯)। হাজারে আসওয়াদকে যদি হাত দ্বারা বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে কেবলমাত্র হাজারে আসওয়াদের প্রতি নিজ হাতে ইশারা করে আল্লাহ্ আকবার বলবে (বুখারী ১৬১৩)। ইশারাকৃত হাত চুম্বন করবে না এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে (বুখারী ১৬০৯)। কিন্তু চুম্বন দিবে না। আর স্পর্শ করা সম্ভব না হলে তার প্রতি ইশারা করবে না এবং রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত চক্কর দেওয়ার সময় ঃ—

রাব্বানা আ-তিন ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার পড়বে (আবূ দাউদ ১৮৯২, ইবনু হিব্বান ৩৮২৬)।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক চক্করের জন্য পৃথক পৃথক দুআর কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং সৌদী মুফতী শাইখ ইবনু বায (রহঃ) বলেন, তাওয়াফ ও সাঈর সময়ে নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই। তবে কিছু লোক তাওয়াফ কালে বা সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাকালে পাঠ করার জন্য কতকগুলি যিকর ও দুআ নিজে থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছে। এসবই শরীয়তের মধ্যে নতুনভাবে প্রবর্তিত অভিনব রীতি যার কোনো ভীতি নেই (মাজমূ ফাতাওয়া ১৬/৬১-৬২)। শাইখ উসাইমীন (রহঃ) বলেন, এগুলো বিদ্‌আত (মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ২২/৩৩৬)।

তাওয়াফ হতে ফারেগ হওয়ার পর আগের ন্যায় চাদর পরিধান করবে (এরপরে আর কোনো তাওয়াফেই ইযতিবা ও রমল নেই)। অতঃপর মাক্বামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হবে ও পড়বে — অত্তাখিযূ মিম মাক্বা-মি ইবরা-হীমা মুস্বাল্লা এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু রাকাআত স্বলাত আদায় করবে (সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোনো জায়গায় পড়ে নিবে)। উক্ত দু রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ও ইখলাস পড়বে। অতঃপর যমযমের নিকট আসবে এবং তা থেকে পানি পান করবে ও যমযমের পানি মাথায় গড়িয়ে দেবে। তারপর হাজরে আসওয়াদের দিকে আসবে ও (আগের ন্যায়) তাকে স্পর্শ করবে (আহমাদ ১৫২৪৩, আবূ আওয়ানা ৩৪১৬)। অতঃপর বাবে সাফা দিয়ে বের হবে এবং সাফার নিকটবর্তী হলে পড়বে ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ-য়িরিল্লাহ্ (সূরা বাক্বারাহ্ ২/১৫৮)। আবদাউ বিমা বাদা আল্লাহু বিহ্। তারপর সাফা পর্বতে আরোহণ করবে এবং কিবলামুখী হয়ে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আকবার' বলে পড়বে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহ্, আন্‌জাযা অ'দাহ্, অনাস্বারা আবদাহ্ অ হাযামাল আহযাবা অহ্‌দাহ্' — এই দুআ ৩ বার বলবে; অতঃপর দুআ করবে। তারপর মারওয়া পর্বতে যাবে। সাফা ও মারওয়ার মাঝে দুই সবুজ বাতির মধ্যখানে (পুরুষেরা) জোরে জোরে চলবে। আর মারওয়া পর্বতে আরোহন করে তাই করবে যা সাফা পর্বতে করেছে। এইভাবে ৭ বার সাঈ করবে সাফা থেকে শুর ও মারওয়াতে শেষ। অতঃপর মাথার চুল ছোট করে ইহ্‌রামের বস্ত্র খুলে হালাল হয়ে

যাবে (মুসলিম ১২১৮, আবু দাউদ ১৯০৫)।

তারপর ৮ই যুলহিজ্জাহ্ নিজ অবস্থান স্থল হতেই হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে (পূর্বে বর্ণিত উমরার ন্যায়)। কিন্তু এক্ষেত্রে 'লাব্বাইকা উমরাহ্' এর পরিবর্তে বলবে ''লাব্বাইকা হাজ্জাহ্'' (বুখারী ১৫৬৮) এবং মিনা অভিমুখে যাত্রা করবে। মিনায় যুহর হতে ফযর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাত পড়বে।

৯ই যুলহিজ্জাহ্ সূর্য উদিত হওয়ার পর মিনা হতে আরাফা যাবে আর সম্ভব হলে 'নামেরা' নামক ময়দানে অবস্থান করবে এবং যুহর ও আসরের স্বলাত একই আযানে পড়বে তবে প্রত্যেক স্বলাতের জন্য পৃথক ইকামাত দিবে। তারপর 'জাবালে রাহমাত' নামক পর্বতের নিম্নভূমিতে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে ও দুআ করবে। অবশ্য আরাফার প্রান্তর সমস্তই অবস্থান স্থল (মুসলিম ১২১৮, আবু দাউদ ১৯০৫)। ৯ই যুলহিজ্জাহ্ সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আরাফায় থাকবে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার অল্প সময় পরেই মুযদালিফা যাবে এবং একই আযান ও পৃথক ইকামাত দিয়ে মাগরিব ও ঈশার স্বলাত পড়বে। অতঃপর সুবহে সাদিক পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। তারপর আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের স্বলাত পড়ে মাশআরে হারামের কাছে আসবে এবং কিবলামুখী হয়ে দুআ-যিকর, তাকবীর-তাহলীল করবে। ১০ই যিলহিজ্জাহ্ সূর্য উদিত হওয়ার অল্প সময় পূর্বে মীনা অভিমুখে যাত্রা করবে এবং মুহাস্সির উপত্যকায় দ্রুত চলবে (মুসলিম ১২১৮)। তবে দুর্বল ব্যক্তিরা চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর রাত্রেই মীনায় গমন করতে পারে (বুখারী ১৬৭৬-১৬৮১)। জামরায়ে আকাবায় কাঁকর না মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে (বুখারী ১৬৮৫) এবং সূর্য উদিত হলে (চাষতের সময়) প্রায় কাবলী ছোলার সমপরিমাণ সাতটি কাঁকর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের মাথা দ্বারা নিক্ষেপ করবে। আর প্রতিটি কাঁকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে (মুসলিম ১২১৮, আবু দাউদ ১৯২০, তিরমিযী ৮৯৩)। এরপর ইহ্রামের কারণে যা অবৈধ হয়েছিল তার সবই বৈধ হবে, স্ত্রী সহবাস ব্যতীত (ইবনু মাজাহ্ ৩-৪১, সিলসিলাহ্ সহীহ্হা ২৩৯)।

১০ই যিলহিজ্জাহ্ কাঁকর মারার পর কুরবানী করবে, মাথা মুণ্ডন করবে তবে চুল ছোটও করতে পারে (বুখারী ১৭২৮, ১৭১১)। কিন্তু মহিলারা কেবলমাত্র চুলের অগ্রভাগ অল্প পরিমাণে কাটবে (আবু দাউদ ১৯৮৫)। তাওয়াফে যিয়ারাহ্ করবে (বুখারী ১৭৩৩, ১৫৭২) এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতের সাঈ করবে (বুখারী ১৫৭২, বাইহাকী কুবরা ৮৮৮৯)। এর মাধ্যমে হাজ্জে তামাত্তু উদযাপনকারী ব্যক্তির হাজ্জ পূর্ণ হবে এবং স্ত্রীও তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু হাজ্জে ইফরাদ ও ক্বিরান উদ্যাপনকারী ব্যক্তি যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথেই সাফা ও মারওয়া পর্বতের সাঈ করে নেয় তাহলে তার জন্যও তাওয়াফে ইফাযার পরই স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে। কারণ তাদের জন্য সাঈ একবারই (মুসলিম ১২১৫, আবু দাউদ ১৮৯৫)। অতঃপর মিনা যাবে এবং আইয়্যামে তাশরীকের রাতগুলো সেখানেই অবস্থান করবে। আর এদিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রতিটি জামরায় তাকবীর সহকারে ৭টি করে কাঁকর নিক্ষেপ করবে (আবু দাউদ ১৯৭৩, আহমাদ ২৪৫৯২, ইবনু হিব্বান ৩৮৬৮)। অতএব ১১ই যুলহিজ্জাহ্ সূর্য ঢলার পর মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরায়ে দুনয়ায় তাকবীর সহকারে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দুআ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায়ে প্রথমবারের ন্যায় সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। তারপর একটু বাঁদিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দুআ করবে। অবশেষে বাতনেওয়াদী হতে জামরায়ে আকবায় কাঁকর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সেখানে দাঁড়াবে না (বুখারী ১, বাইহাকী কুবরা ৯৬৬৩)।

অতঃপর ১২ ও ১৩ই যুলহিজাহ্ ১১ই যুলহিজ্জার ন্যায়ই কাঁকর মারবে ও দুআ করবে। অবশ্য কেউ যদি ১২ই যুলহিজ্জার কাঁকর মারার পর মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে কোনো পাপ নেই (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২০৩, আবূ দাউদ ১৯৪৯)। তবে উত্তম হল ১৩ই যুলহিজ্জাও কাঁকর নিক্ষেপ করা।

পরিশেষে বিদায়ী তাওয়াফ করবে। আর এটা মক্কা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলাদের জন্য এই বিদায়ী তাওয়াফ অপরিহার্য নয় (বুখারী ১৭৫৫, মুসলিম ১৩২৭)।

প্রকাশ থাকে যে, জামা বাইনাস স্বলাতাইন অর্থাৎ দু স্বলাতকে এক আযান ও দু-ইকামাতে একসাথে পড়ার সময় মধ্যখানে কোনো স্বলাত নেই (বুখারী ১৬৭২, মুসলিম ১২১৮)।

এ ব্যাপারে ইবনুল মুনযির ইজমা নকল করেছেন (ফাতহুল বারী ৩/২৫৩)।

বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আবুল কাশিম গঙ্গাপ্রসাদী, শাইখ আব্দুল মাতীন সালাফী, শাইখ আব্দুল হামীদ মাদানী, ডাঃ আসাদুল্লাহ্ আল্ গালিব ও শাইখ ইবনে বায়ের হাজ্জ সংক্রান্ত বই দ্রষ্টব্য।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ সাধনে সিয়ামের উপকারীতা

মুহাম্মাদ ইসমাঈল

পবিত্র রমাযানের সিয়াম সাধনায় মানুষের শরীরে স্বাস্থ্যগত কোনো ক্ষতি তো হয় না বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাস্থ্যগত কল্যাণ সাধনেও রমাযানের রোযা উপকারী। রোযার অর্থ অনাহার বা উপবাস করার নাম নয় বরং প্রতি বৎসর ১ মাসের জন্য খাদ্য গ্রহণের সময় সূচী পরিবর্তন করা হয়। এ মাসে সন্ধ্যা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত পানাহার করা হয়। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। এতে স্বাস্থ্যহানী কিংবা পুষ্টির অভাব জনিত সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনাই নেই। উপরন্ত এতে রয়েছে বিশেষ শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত নানাবিধ কল্যাণ।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখেছেন যে, সিয়াম পালনের ফলে শরীরের অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পায় এবং বিপাক ক্রিয়া শক্তিশালী হয়, যা ডায়াবেটিস রোগ আত্মরক্ষার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। ডায়াবেটিস মারাত্মক বিপাক যাকে (Metabdism) জনিত রোগ বলা হয়। মানবদেহের প্যানক্রিয়াস' বা অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreas gland) থেকে ইনসুলিন নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় এই ইনসুলিন গ্লুকোজকে ভেঙে শরীরে বিভিন্ন কাজে লাগায়। কিন্তু প্যানক্রিয়াস গ্লান্ড থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর নাম হলো ডায়াবেটিস'। করুণাময় আল্লাহ্ বৎসরে ১ মাস সিয়ামের বিধানকে বিধিবদ্ধ করেছেন এই জন্য যে, এতে করে বিপাক ক্রিয়া সক্রিয় থাকে এবং প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে ইনুসুলিন নিঃসরণের বিপত্তি ঘটে না। আর কেবলমাত্র মুমিনগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সিয়াম পালন করতে গিয়ে এইরূপ স্বাস্থ্যগত শারীরিক কল্যাণ ও লাভ করতে থাকেন।

এখন তো প্রায়ই দেখা যায় মানুষ হঠাৎ হার্ট ফেল করে। হার্টের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলে করোনারী ধমোনীর মধ্য দিয়ে আনেক শাখা প্রশাখা হৃৎপিণ্ডের বেশী ভেতরে বিস্তার লাভ করে এবং কোষ সমূহের স্বাভাবিক কাজকর্ম ঠিক রাখে। কিন্তু হার্টের কাজকর্মে বিপত্তি ঘটে তখন, যখন করোনারী ধমনীতে জমে যায় টুকরো টুকরো চর্বি। ফলে রক্ত প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। আর এই কারণেই হঠাৎ হার্ট ফেল করে। কেউ কেউ মারাও যায়। কিন্তু বৎসরে ১ মাস রোযা পালন করার ফলে অধিকাংশই ক্ষেত্রে করোনারী ধমনী চর্বী মুক্ত থাকে। বিভিন্ন বিজ্ঞান ম্যাগাজিন থেকে জানা যাচ্ছে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মুসলিম দেশের সিয়াম পালনকারীদের উপর জরিপ পরিচালনা করে বিস্ময়কর এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।

গ্যাসট্রিক রোগীদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সিয়াম পালনের কারণে তাদের ধারণা মতে Acidity তো বৃদ্ধি পায় না বরং দীর্ঘ ১মাস সিয়াম পালন করলে অস্বাভাবিক গ্যাসট্রিক অ্যাসিডিটি (Abnormal Gastric Acidity) স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে এবং পেপটিক আলসার থেকে রোগী পর্যায় ক্রমে পরিত্রাণ লাভ করে। Scientific Indication in the Holy Quran গ্রন্থে Hess এ cleave এর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন যে, রমাযান মাসে দীর্ঘ ১ মাস যাবৎ সিয়ামের ফলে গ্যাসট্রিক অম্লতা কমে যায় এবং Hypo ও Hyper অম্লতা (Acidity) স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। তারা মিশরীও গ্রামবাসীদের ও উত্তর নাইজেরিয়ার অধিবাসীদের এবং জাভা ও মালয়ী মুসলিমদের উপর জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদন দেখিয়েছেন যে, বৎসরে ১মাস সিয়াম পালনের কারণে তাদের ঐ রোগ নেই। এরা সিয়াম পালন করে বলেই এদের মধ্যে পেপটিক আলসার রোগের আক্রমণ নেই বললেই চলে।

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ Dr. Dewey এ বিষয়ে গবেষণার রিপোর্ট পেশ করে বলেছেন, "Take the food away from stomach and then you have begun to starve not the sick man but the disease. The digestive organs are given some rest to work with redoubled energy and vigur just as a land which was left without cultivation for one year following of just as a man can work with redoubled vigour after some rest."

এ সকল তথ্য থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, সিয়াম পালন কররা দরুন গ্যাসট্রিক অ্যাসিডিটি অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং রোগী পেপটিক আলসার থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ গ্যাসট্রিকের বিরুদ্ধে সিয়াম ঢালের মত কাজ করে। পাকস্থলী বিশ্রাম পায় বিধায় পরিপাকে সক্রিয় অংশগুলো দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে যা পরবর্তী কার্য সম্পাদনে শক্তি যোগায়। এখন দেখা যাচ্ছে সিয়াম ঢাল স্বরূপ।

যাকাতুল্ ফিৎর

সরল পথ পরিষদ

যাকাতুল্ ফিৎর এর তাৎপর্য

যাকাতুল্ ফিৎর বলতে সেই যাকাতকে বোঝায়, যা রমাযানের রোযা শেষ করার কারণে ধার্য করা হয়। একে সাদ্কায়ে ফিৎরও বলা হয়। আবার রমাযানের যাকাত, মাথার যাকাত ও শরীরের যাকাত বলেও অভিহিত করা হয়েছে (মিরআতুল মাফাতীহ ৩/৯১)। এ যাকাত অন্য সব যাকাত থেকে স্বতন্ত্র, কেননা এটি ব্যক্তির উপর ধার্য করা হয় আর অন্যগুলো ধার্য হয় ধন-মালের উপর। এ কারণে অপরাপর যা কিছু শর্ত, এখানে সেগুলো গণ্য করা হয়নি। যাকাতের নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক সেই মুসলিমের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয, যার নিজের এবং তার ওপর নির্ভরশীল লোকদের ঈদের দিন ও রাতের প্রয়োজনীয় খাবারের অতিরিক্ত খাদ্য থাকবে (মিরআত ৩/৯৩-৯৪, আল মুগনী ৪/৩০৭, শারহুল মুহায্যাব - ৬/৮৮, ৯৮, রাওযাতুন্নাদিয়্যাহ ১/৫১৯-৫২০, ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৩৮, ৪৫০-৪৫১)।

যাকাতুল্ ফিৎরের হুকুম

ফিৎরের যাকাত আদায় করা ফরয। ইবনু উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের উপর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যাকাতুল্ ফিৎর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের স্বলাতে বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী ১০৩, মুসলিম ৯৮৪, আবূ দাউদ ১৬১১)।

যাকাতুল ফিৎরের হিকমাত

এ যাকাত ফরয করা হয়েছে দুটি কারণে — (১) রমাযান মাসের রোযাদারদের সঙ্গে সম্পর্কিত - তাদের রোযা কোনো অশ্লীল কথাবার্তা ও মন্দ কাজের ফলে ত্রুটিযুক্ত হলে, তা পবিত্র করার জন্য এবং (২) সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত - সমাজের মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতি সঞ্চারিত করা এবং সকলকে ঈদের খুশিতে শামিল করা, কেননা ঈদ তো সাধারণ ভাবে আনন্দ ফূর্তির দিন। তাই সেদিন সমাজের সমস্ত লোক যাতে করে এ আনন্দ ফূর্তিতে যোগদান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইবনু আব্বাস (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, ''রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন রোযাদারকে অনর্থক কথাবার্তা ও অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে পবিত্রকরণ এবং দরিদ্রদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা স্বরূপ'' (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাযাহ্ ১৮২৭, ইরওয়াউল গালীল ৮৪৩)।

যাকাতুল্ ফিৎরের পরিমাণ

যাকাতুল ফিৎরের পরিমাণ এক সা খাদ্য দ্রব্য। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমরা এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিৎর আদায় করতাম'' (বুখারী ১৫০৬, মুসলিম ৯৮৫, আবূ দাউদ ১৬১৬, তিরমিযী ৬৬৮)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ''এটা (এক সা পরিমাণ খাদ্য) আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে (আদায়) করতাম'' (বুখারী ১৫০৮, মুসলিম ৯৮৫)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এক 'সা' মাপ অনুযায়ী বর্তমান যুগে ভাল ধরণের গমের ওজন হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম (সংক্ষিপ্ত মাজালিসে রমাযান, পৃঃ ৮৯)। অবশ্য চাল ইত্যাদি অধিক ঘন খাদ্য দ্রব্যের ওজন তার থেকে বেশি হবে। অতএব এক সা পরিমাণ খাদ্যের মাঝামাঝি ওজন হবে মোটামুটি আড়াই কেজি মত (যাদুস সায়েম ও ফাযলুল কায়েম, পৃঃ ২৯; রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল, পৃঃ ১২৬)। (*'সা' সংক্রান্ত সঠিক পরিমাপ জানতে সরল পথ জুন ২০১৬, সংখ্যার দার্সে হাদীসে 'শস্যের যাকাত' অংশ দেখুন। সঠিক অবগতি পাবেন - ইন্শাআল্লাহ্।*) এছাড়া জমঈয়তে আহ্লে হাদীস মুর্শিদাবাদ, সুদক্ষ কারিগর দ্বারা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ব্যবহৃত ও বর্তমানে মাদীনাবাসীদের সা'এর আদলে 'সা' তৈরি করেছে। সংশয়মুক্ত ফিতরা প্রদানের জন্য জেলা অফিস হতে তা সংগ্রহ করুন। মূল্য ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

যাকাতুল ফিৎরে অর্থ দেওয়া যাবে কি?

খাদ্য শস্যের পরিবর্তে টাকা-পয়সা দেওয়া বৈধ নয় (আল্ মাজমূ'লিন নবাবী ৬/১২৩)। এ কথাই বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনুল মুনযির (আল্ মাজমূ'লিম নবাবী ৬/১২৩, মিরআত ৩/১০০, আল মুগনী ৩/৬৫)। আর এটাই সঠিক কেননা যাকাতুল ফিৎর হল একটি ইবাদত যা তাওক্বীফী (দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সীমাবদ্ধ)। এতে কোনো পরিবর্তন বা বিনিময় চলে না। সুতরাং সৌদি আরবের প্রাক্তন মুফতী আল্লামা ইবনু বায বলেছেন, সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে যাকাতুল ফিৎর হল একটি ইবাদাত এবং ইবাদাতের বিষয়ে মূল হল তাওক্বীফ (অর্থাৎ যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তাকে সে ভাবেই পালন করতে হবে)। অতএব কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এমন কোনো পদ্ধতিতে যার প্রমাণ রসূল থেকে পাওয়া যায় না (ফাতওয়া রমাযান ২/৯২৫-৯২৬)। তাই, সৌদী ফাতাওয়া কমিটি (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯), শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (সিয়াম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর পৃঃ ৪০), শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন জিবরীন, সালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল্লাহ্ ইবনু গুদাইয়ান এবং আব্দুর রায্যাক আল আফীফী সহ অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিতই যাকাতুল ফিৎরে খাদ্য শস্যের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া যাবে না বলে ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। অবশ্য আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী যাকাতুল ফিৎরে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থ দেওয়া জায়েয বলেছেন; তা দুটি কারণে (১) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে আরবে নগদ অর্থ ছিল বিরল। ফলে খাদ্যবস্তু দেওয়াটাই মানুষের পক্ষে সহজ ছিল এবং (২) নগদ মূল্যে ক্রয় ক্ষমতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য সেরূপ নয় (ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৭০)। কিন্তু আমরা বলব উক্ত কথার কোনো যথার্থতা নেই। এমনকী তিনি নিজেও উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে নগদ রোপ্য-মুদ্রা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ছিল (ইসলামের যাকাত বিধান ১/১৪০)। এটাই সঠিক। কেননা যেখানে দুই শত দিরহামে যাকাত ফরয ছিল, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বদ্র যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন (আর্ রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ৩৯৮)। আর হাদীসে বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মূল্য বিভিন্ন অথচ প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য থেকে এক 'সা' পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এক সা'ই আসলে গণ্য, মূল্যের প্রতি কোনো নজর নেই (শার্হে মুসলিম লিন্ নবাবী ৭/৬০, ইসলামের যাকাত বিধান ২/৪৫৪)। তাই তো দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমাদকে সাদকায়ে ফিৎর বাবদ মূল্য প্রদান করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি ভয় করছি যে, তাতে আদায় হবে না। তাছাড়া তা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাতের পরিপন্থীও। তাঁকে বলা হল, "লোকেরা বলে আব্দুল আযীয মূল্য গ্রহণ করতেন।" তিনি বলেন, "এ লোকেরা তো দেখছি, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথাকে বাদ দিয়ে অমুক-তমুকের কথাকে দলীল হিসাবে নিচ্ছে।" ইবনু উমর (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফরয করেছেন (খাদ্যশস্য) এবং আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং মেনে চল রসূলকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (মিরআত ৩/১০০)। অতএব কোন ওজর ব্যতীত মূল্য প্রদান করা বৈধ নয় (মিরআত ৩/১০০, আস্সাইলুল জার্রার ২/৮৬)।

যাকাতুল ফিৎর কখন দিতে হবে ?

যাকাতুল ফিৎর ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা অপরিহার্য। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের স্বলাতের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর আদায় করে সেটা কবুল সাদ্কাহ্ হিসাবে গণ্য হবে (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৮২৭)। তবে ঈদের দুই-তিন দিন পূর্বে একত্রিত করাও বৈধ (বুখারী ১৫১১, ফাতহুল বারী ৩/৪৬০, ৪/৬০০-৬০৩)। তার পূর্বে দেওয়ার ব্যাপারে শারীআতে কোনো দলীল নেই। অতএব তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাকাতুল্ ফিৎর কখন বন্টন করতে হবে ?

যাকাতুল ফিৎর বন্টনের সময় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ কোনো দলীল নেই। তবে তা ফরয হওয়ার তাৎপর্যের দিকে মনোনিবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে, শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে। আল্লামা ওবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করা

ওয়াজিব বলেছেন (মিরআত ৩/৯৫)। এ কথা আব্দুল হামীদ মাদানী (রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল, পৃঃ ১২৯-১৩০), শাইখ ইউসূফ মাদানী (সাদ্‌কায়ে ফিৎর, পৃঃ ৩৯-৪০) এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মাজমূ' ফাতওয়া, খণ্ড ১৮) প্রমুখরাও বলেছেন। এমনকী সৌদি ফাত্‌ওয়া কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঈদের নামযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯, ফাতাওয়া নং ১৩২৩১)। অবশ্য আত্ তাহরীক (৬/২০১১, প্রশ্ন ২/৩২২) পত্রিকায় ঈদের নামাযের পরে বন্টনের প্রমাণ পাওয়া যায় বলে যে হাদীসের বরাত দেওয়া হয়েছে তার ভাবার্থ আদৌ তা নয়। ইবনু হাজার আস্‌কালানী বলেন, ''আবূ হুরাইরা (রাযি আল্লাহু আনহু) এর উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে ঈদের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর একত্রিত করা যায়। আর আল্‌জুযকী তা ঈদের পরে বলে মন্তব্য করেছেন।'' ইবনু হাজার বলেছেন, ''এ দুটোই হতে পারে'' (ফাতহুল বারী ৩/৪৬০)। অতঃপর তিনি ঈদের রাতের পূর্বে একত্রিত করা এবং ঈদের রাতে বন্টনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন (ফাত্‌হুল বারী ৪/৬০০-৬০৩)। আর এটাই সঠিক। সুতরাং ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদুল ফিৎরের ২/৩ দিন পূর্বেই যাকাতুল ফিৎর তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন যার কাছে জমা হত (মোয়াত্তা মালেক, পৃঃ ১২৪) এবং শাইখ ইউসূফ মাদানী, ঈদের ৩ দিন পূর্বেই দরিদ্রদের দেওয়া বৈধ (সাদকায়ে ফিৎর পৃঃ ৪২) বলে যে মন্তব্য করেছেন তারও কোনো দলীল নেই (মিরআত ৩/১০২)। আসলে যে দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা দ্বারা দরিদ্রদের দেওয়া বোঝায় না; বরং একত্রিত করাই বোঝায় যা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে (ফাতহুল বারী ৩/৪৫০, মিরআত ৩/১০২)। **অতএব শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের এবং ঈদের নামাযের পূর্বেই বন্টন করতে হবে। এ কথাই বলেছেন সৌদি ফাতওয়া কমিটি (ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ২৮৯৬)।**

যাকাতুল ফিৎরের হক্কদার কে?

যাকাতুল ফিৎরের হক্কদার একমাত্র দরিদ্র অভাবগ্রস্তগণ। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তা দরিদ্রদের আহার স্বরূপ ফরয করেছেন (আবূ দাউদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৮২৭)। আবূ দাউদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (আওনুল মা'বুদ ৫/৩), শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (মাজমূ' উল ফাতাওয়া ১৩/৪৫-৪৮, ২৫/৩৮, ২/৮১-৮৪), ইবনুল কাইয়্যেম (যাদুল মাআদ ২/২১, তোশায়ে আখেরাত ১/৩৮১), আল্লামা আলবানী (তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ৩৮৭), শাইখ ইবনু সালেহ উসাইমীন (মাজমু' ফাতাওযা, খণ্ড ১৮) এবং সৌদি ফাতাওয়া কমিটি (ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৩৭৯) প্রমুখরা একথাই বলেছেন, আর শাইখ আলবানী সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত দ্বারা যাকাতুল ফিৎরকে ৮ ভাগে বিভক্ত করা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন, কেননা তা যাকাতুল আমওয়ালের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে (তামামূল মিন্নাহ্ পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭)। তাই তো ইমাম ইবনু রুশদ বলেছেন, যাকাতুল ফিৎর কেবল দরিদ্রদের হক্ক। এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে (বেদায়াতুল মুজতাহিদ ৩/১৪১, সাদকায়ে ফিৎর আউর উসকে মাসায়িল পৃঃ ৪৭)। অতএব যে কোনো দরিদ্র মানুষই যাকাতুল ফিৎরের হক্কদার। আর যদি দ্বীনী বিদ্যার্থী, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক এবং আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তিগণ দরিদ্র হয় তাহলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ বলে থাকেন, তাহলে যাকাতুল ফিৎর নেওয়ার জন্য লোকই পাওয়া যাবে না। কেননা, যার ঘরে সকাল সন্ধ্যার খাবার আছে তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''যদি সে চায় তাহলে সে জাহান্নামের আগুন চেয়ে নিল।'' আমরা বলবো উক্ত হাদীসের তাৎপর্য হল এই যে, এক সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সামগ্রী যার ঘরে আছে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হারাম। আর যে নিসাবের মালিক তার উপর যাকাত ফরয এবং যে নিসাবের মালিক নয় তার জন্য যাকাত বৈধ। কেননা, সে দরিদ্র। এ কথাই বলেছেন আল্লামা ওবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী (মিরআত ৩/১১৪)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন — যারা আল্লাহ্‌র পথে অবরুদ্ধ, ভূ-পৃষ্ঠে গমনাগমনে অপারগ, সেই সব দরিদ্রদের জন্য ব্যয় কর, (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থা সম্পন্ন বলে মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণের দ্বারা চিনতে পারবে, তারা লোকের নিকটে কাকুতি মিনতি করে চায় না এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত (সূরা বাক্বারা ২৭৩)।

রমাযান মাসে সাহারীর আযান ও ইফতারের জন্য আযানের শারয়ী বিধান

আব্দুল্লাহিল কাফী সালাফী

রমাযান মাসে সাহারির আযান ছাড়া মুয়ায্যিনের ও ইমামের দুআ পাঠ, গজল, কুরআন আবৃত্তি এবং সময় সম্পর্কে ঘোষণা করতে গিয়ে যেসব বাড়াবাড়ি করেন তা সবই বিদআত। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের যুগে অনুরূপ আমলের একটি জাল, যঈফ বা কোনো হাদীসের নযীর পাওয়া যায় না। এমনকী ৩০-৩৫ বছরপূর্বে গ্রামের মাসজিদে মাইক ঢুকবার আগেও ইমাম ও মুয়ায্যিন অনুরূপ বাড়াবাড়ি করতেন না।

অনুতাপের বিষয় বিভিন্ন এলাকায় এমনও অনেক শরীয়ত অনভিজ্ঞ মুয়ায্যিন আছেন যাঁরা রমাযান মাসে জনসাধারণকে সাহারী খাওয়ার জন্য জাগানোর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আযান শেষে মাইকে স্বরবে দুআ তো পাঠ করেনই এমনকী তাঁর মত গানের স্বরে গজল মুখস্ত আছে সেগুলো মন মাতানো কোকিল কণ্ঠে মধুর সুরে শুরু করে দেন গাইতে। কেউ আবার কুরআন পাঠ করেন। তারপর শুরু হয়ে যায় সময় সম্পর্কে সচেতন করতে প্রচারিত বিশেষ বুলেটিন :—

আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে, আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে। হঠাৎ বলে উঠেন সাহারীর সময় শেষ এই বলে আযান শুরু করে দেন। অনুরূপ ইফতারের জন্য মানুষকে সচেতন করেন যে আর মাত্র ১ ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা সময় আছে আপনারা মিসওয়াক করে অযূ করে ইফতার নিয়ে বসে পড়ুন।

এমনকী মানুষকে সাহারী ও ইফতারের জন্য মাইকিং করা বা সাইরিন বাজানো, ঘণ্টা বাজানো বা পাড়ায় পাড়ায় কোনো কাফেলা পাঠানো এই সমস্ত বিদ্আত, এক কথায় সাহারী বা ইফতারের জন্য আযান ছাড়া কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না, এসব বন্ধ।

এবার আলোচনা করা যাক, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেন —

عـن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ قال ان بلالا ينادى بليل فكلوا و اشربوا حتٰى ينادى ابن ام مكتوم.

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় বিলাল রাত্রির আযান দেয়, কাজেই তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম আযান না দেয় (মিশকাত হাঃ ৬৮০, এ ব্যাপারে আরোও বিস্তারিত জানতে দেখুন, বুখারী হাঃ ৬১৭, ৬২০, ৬২৩ মুসলিম হাঃ ০১৯২, আহমাদ ৪৫৫১, ২৪২২৩, মিশকাত ৬৮১, তিরমিযী ৭০৬, আবু দাউদ হাঃ ২০৩১, নায়লুল আওতার ২/ ১১৭।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সাহারীর জন্য আযান ছাড়া কিছুই চলে না। আর আযান ছাড়া অন্য পথ মানুষের সুবিধার জন্য অবলম্বন করতে গেলেই মুর্খামী করা হবে, আর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অপমান করা হবে।

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র বিনা মাইকের আযানে ঘুমন্ত মানুষেরা জেগে যেতেন, আর এখন বেচারা ইমাম ও মুয়ায্যিনগণ মাইকে আযান দেওয়ার পর গজল বলে, কুরআন আবৃত্তি করে ও সময় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রচারিত বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম চেঁচামেচি করে লোকদের জাগাতে ব্যস্ত। মুয়ায্যিন বেচারা ভুলেই যায় যে তিনি ইতিপূর্বে আযান দিয়ে মানুষকে জাগ্রত করেছেন সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর আযান দেওয়ার পর এসব কাজ করলে হাদীসে বর্ণিত আযানের উদ্দেশ্য যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি আযানের অমর্যাদাও করা হয়। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী আযান শুনে রাত্রের স্বলাতরত লোকেরা গিয়ে সাহারী খেয়ে একটু ঘুমাবে আর ঘুমন্ত মানুষেরা জেগে সাহারী খেয়ে যে সামান্য ঘুমাবে তার ১২টা বাজল এই ইমাম ও মুয়ায্যিনদের বিদআতি কর্মকাণ্ডে।

ওগো বিদ্আতি ইমাম ও মুয়ায্যিন ভাইয়েরা! বিনা মাইকে পারবেন এরকম জোরে চিৎকারে এই রকম কাজগুলি করতে? একবার কি ভেবে দেখেছেন সমাজে অনেক শ্রমিক লোক আছেন যারা সারাদিন পরিশ্রম করেছেন, অনেক অসুস্থ রোগীও। রাত জেগে স্বলাতরত মানুষদের সাহারী খাবার পর আরামের ঘুমটুকু কেড়ে নিলেন? তা আবার ধর্মের বা দ্বীনের নামে। তাহলে এ কোন্ দ্বীন? কার দ্বীন? আর আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাণী দ্বারা জানা যায় —

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ১৪০)।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردٌّ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, কেউ যদি কোনো আমল করে আর সে আমলের উপর কোনো নির্দেশনা না থাকে তা হলে প্রত্যাখ্যাত (বুখারী হাঃ নং ১০৯২, মুসলিম হাঃ নং ৪৪৬৮, মীমাংসা অধ্যায়)।

উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি কোনো আমল করে আর তাতে যদি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কোনো নির্দেশনা না থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত। তাহলে যে সমস্ত ইমাম ও মুয়ায্যিনরা সাহারীর আযানের পর ও ইফতারের পূর্বে বারংবার মাসজিদের মাইকে ক্বিরাত বা গজল এবং মানুষকে সচেতন করেন যে আর মাত্র ১ ঘণ্টা বা ২০ মিনিট সময় আছে ইফতার নিয়ে বসে যান বা সাহারী খেতে শুরু করেন এই সব বলা উচিত নয়। কেননা মাসজিদের মাইকে আযান ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে গজল, ক্বিরাত, নসীহাত দ্বীনি তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত নিঃসন্দেহে একটি উত্তম যিকির। হ্যাঁ আপনাদের সাথে আমি একমত যে, সেই কাজ উত্তম যিকির বা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও স্থান কাল পাত্র ভেদে এক সুনির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। তাই বলে যখন তখন যেখানে সেখানে নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই? সে সময় মুয়ায্যিন ভাই ভালো মনে কুরআন তেলাওয়াত, নসীহত করেন ও সময় সম্পর্কে বুলেটিন প্রচার করেন? এ সময় হয়তো কেই তারাবীর স্বলাত আদায় করছেন, কেউবা হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছেন বা একটা অসুস্থ রুগী একটু ঘুমাবার জন্য ছটপট করছেন তাদের কথা কে ভাবে? কেউ বা ঘুমার চেষ্টা করতে গিয়ে কুরআন মাজীদ শোনার প্রতি বিরক্ত হচ্ছে। সেই গুনাহ্টাও আল্লাহ্র নীতিতে সেই ইমাম বা মুয়ায্যিনের অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে। যে লোক তাহাজ্জুদ ও তারাবীর স্বলাত আদায় করছেন তাঁরও ক্বিরাত বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে মাইকে পঠিত ক্বিরাত, গজল, বারংবার সময় সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে। আর সেই সময় স্বলাত আদায়কারীর ক্বিরাত ফরয আর আপনার পাঠ করা ক্বিরাত নফল তাও আবার একেবারে অসময়ে এবং প্রচণ্ড জোরে। প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি বলেননি কেউ স্বলাত আদায় করলে কুরআন মাজীদ স্বশব্দে পড়া যাবে না (আহমাদ, তাবারাণী, সহীহ্ আবু দাউদ হাঃ ১২৩০, সহীহ্ জামেউস সাগীর হাঃ ১৯৫১)।

আল্লাহ্ তাআলা কি বলেননি যখন কুরআন আবৃত্তি করা হয় তখন তোমরা চুপ করে শোনো (সূরা আরাফ, আয়াত নং ২০৪)। তাহলে কি স্বলাত আদায়কারী, ব্যক্তিগত পাঠকারী ও অন্যান্য সুস্থ, অসুস্থ সকলেই চুপ করে আপনার সুমধুর কণ্ঠের ক্বিরাত তেলাওয়াত শুনবে? হয়ত বলেন, এটা তো আমরা মানুষের ভালোর জন্য, সুবিধার জন্য করে থাকি? তাহলে মানুষের এতো অসুবিধা করে, কী করে সুবিধা করে দেওয়া হয় মাথায় আসে না। তবে তো বলতে হয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কতৃর্ক প্রদত্ত বিধানে মানুষের কল্যাণ নেই (নাউযুবিল্লাহ্)।

অতএব আযান ছাড়া যে সমস্ত কাজ করা হয় সব বিদআত ঐগুলোকে তিন তালাক দিন (মু'জামূল বিদা ২৬৮ পৃঃ)।

ইমাম ও মুয়ায্যিন ভাইদের নিকট আমার আবেদন, সাহারীর আযান দিয়ে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মত চুপ করে যান, আর ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র মত ফজরের আযান দিয়ে দুআ না পড়ে চুপ করে সহীহ্ সুন্নাহ্র মর্যাদা দিন। আর যদি না পারেন তাহলে আযান শেষে মাইকের সুইচ বন্ধ করে শুধু মুখে চেঁচিয়ে এসব কৃতিত্ব বজায় রাখুন দেখি। এবার হয়তো আপনিও বলবেন এ নীতি শারীয়াতী নীতি নয়। জনসাধারণ ঐ বিদআতগুলিকে যতই ভাল মনে করুক না কেন আলিম সমাজ ও মুয়ায্যিনদেরকে শরীয়তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকা একান্তই জরুরী।

পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! শরীয়তে সীমারেখা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন —

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا، وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥

অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, যার নিচে স্রোতস্বিনী নদী সমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং সেটাই বড় সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অমান্য করবে এবং তাঁর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, তার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৩-১৪)।

উপরোক্ত আয়াত হতে পরিস্কার বুঝা গেল, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই হল আল্লাহ্ তাআলার সীমা এবং এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থানকারীদের জান্নাত প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

অর্থাৎ জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম ও প্রধানতম শর্ত হল আল্লাহ্ তাআলার ও তাঁর প্রিয় রসূলের পূর্ণ অনুসরণ নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্য থেকে। নিজের মনে বাহাদুরী করে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে কোনো নতুন সংযোজন অথবা বিয়োজন করা কোনো মতেই চলবে না।

عن انس رضى الله عنه زيد بن ثابتٍ قال تسحرنا مع النبى ﷺ ثم قام الى الصلوة قلت كم كان بين الأذان و السحور ؟ قال قدر خمسين آية.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, যায়েদ বিন সাবিত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাহারী খেয়ে (ফজরের) স্বলাত পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহারী খাওয়া ও আযান হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? উত্তরে যায়েদ বলেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে। অন্য বর্ণনায় ষাটটি (বুখারী হাঃ নং ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম হাঃ নং ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩)।

এখানে আয়াত বলতে মধ্যম ধরণের আয়াত গণ্য হবে। এই শ্রেণির ৫০/৬০টি আয়াত পড়তে মোটামুটি ২০/২৫ মিনিট সময় লাগে। অতএব সুন্নাত হল আযানের ২০/২৫ মিনিট আগে সাহারী খাওয়া।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীগণ খুব তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করতেন এবং খুব দেরী করে সাহারী খেতেন (বুখারী হাঃ ৪ খণ্ড ২৩৮, ইআশা ৮৯৩২ নং)।

নোট ঃ আমরা সাহারীর আযানকে ভাল রান্নার আযান মনে করে রাত্রি ১টার সময় দিই সেটাও উচিত নয়, কেননা আযান দেওয়া হতো সাহারী খাওয়ার জন্য, আর সেই আযানটি হবে ফজরের আযানের আধ ঘণ্টা পূর্বে, যেমনটা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দিতেন (বুখারী হাঃ নং ১৯২১, মিশকাত হাঃ নং ৫৮০)।

শীঘ্র ইফতার : খোদ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আসল জলদি ইফতার করা। আবু আতিয়া বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীনা! রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর একজন সাহাবী (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি স্বলাত পড়ে; আর অপর একজন দেরী করে ইফতার করে, দেরী করে স্বলাত পড়ে। তিনি বলেন, ওদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও স্বলাত পড়ে। তিনি (আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অনুরূপ করতেন' (মুসলিম হাঃ নং ১০৯৯)।

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, খুব তাড়াতাড়ি ইফতার করতে হবে এবং স্বলাত পড়তে হবে। মাসজিদের মাইকে বারংবার বলা উচিত নয় যে, আর মাত্র দুই মিনিট, ৫ মিনিট সময় আছে। সূর্য ডুবা মাত্রই আযান দিয়ে দিতে হবে, ইফতার করুন বলা যাবে না, সেটাও হাদীসের খিলাফ।

হে আল্লাহ্! আমাদের সঠিক দ্বীন বোঝার ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দাও — আমীন।

সিয়াম ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

মহম্মদ মায্হারুল ইসলাম

এটা এক অপ্রিয় সত্য কথা যে, রমাযান মাস ও এ মাসে অবশ্য পালনীয় সিয়াম সম্পর্কে তথাকথিত ও জন্মসূত্রে নামধারী মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা নাই। তাই এ সম্পর্কে একটি পরিস্কার ও বিশুদ্ধ ধারণা সবার জানা প্রয়োজন মনে করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

(১) রমাযান মাসের মর্যাদা : হিজরী সনের নবম মাস এই মাহে রমাযান। মুসলিম মাত্রই এ মাসের মর্যাদা সম্পর্কে অল্প-বিস্তর অবহিত। আল্লাহ্ বলেন, '' হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার'' (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৩)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয়ই আমি এটা (আল্ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম'' (সূরা কদর, আয়াত ১-৩)। বলা বাহুল্য কুরআনের উক্ত বাণীসমূহ রমাযানের মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে।

এ মাসের মর্যাদায় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কয়েকটি হাদীস —

(ক) রমাযান এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানগুলিকে শিকলবন্দী করে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম)।

(খ) ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, তার মধ্যে একটি রমাযান মাসের সিয়াম (বুখারী, মুসলিম)।

(গ) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সমস্ত লোকের থেকে বেশি দানশীল ছিলেন। রমাযানে জিবরাঈল (আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রমাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে কুরআন শোনাতেন (বুখারী, মুসলিম)।

এরূপ বহু সহীহ্ হাদীসে রমাযানের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাই গুরুত্বসহকারে এ মাসের মর্যাদা দানে আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

(২) সিয়ামের মর্যাদা : রমাযানের এত মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের জন্যই। অধিক বর্ণনা না করে কয়েকটি সহীহ্ হাদীস দ্বারাই এর মর্যাদা বুঝবার চেষ্টা করি। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, ''সিয়াম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।'' সিয়াম ঢাল স্বরূপ অতএব তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং হৈ হট্টগোল না করে। নিঃসন্দেহে সিয়ামপালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগ নাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশি উৎকৃষ্ট। সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে — (ক) যখন সে ইফতার করে, (খ) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কেবলমাত্র সিয়াম পালনকারীরাই 'রাইয়ান' নামক দরজা দিয়ে বেহেস্তে ঢুকবে (উক্ত হাদীসগুলি বুখারী ও মুসলিম থেকে সংক্ষেপে গৃহীত)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাত্র একটি দিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূর করে দেবেন'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)। এই সত্তর বছরের পথ পায়ে হেঁটে না ঘোড়ায় চড়ে না অন্য কোনো যানে হাদীসে তা বলা হয়নি। সুতরাং এর ভাবার্থ হল হাজার হাজার বা লাখ লাখ মাইল দূরে করে দেবেন। সিয়ামের মর্যাদা বর্ণনায় এরূপ বহু সহীহ্ হাদীস বর্তমান। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সিয়াম ছাড়া একজন মানুষের জন্য রমাযানে কোনো উপকার নাই; সিয়াম ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না। সিয়ামকে আল্লাহ্র বিধান মনে করেই পালন করতে হবে। অন্যথায় তা বৃথা হবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যথায় তা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। সিয়াম পালনকারী ঈমানদার অবস্থায় থাকে। তাই মহান আল্লাহ্ নিজ হাতে এর পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন এবং এই বিধান মান্যকারীর পূর্বের সব (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ্! একজন মুমিনের এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? তাই আমাদের চেষ্টা থাকবে রমাযান মাসে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় শরীয়ত নির্দিষ্ট পথে যেন আমরা সিয়াম পালন করতে পারি।

(৩) সাহারী : সিয়াম রাখার উদ্দেশ্যে ভোরবেলা যে খাওয়া ও পান করা হয় তাকে বলা হয় সাহারী। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীর মধ্যে বরকত নিহিত আছে'' (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিম ও মিশকাতের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীস অনুযায়ী জানা যায়-যারা সিয়ামের

উদ্দেশ্যে সাহারী খায় না তাদের সিয়াম এবং ইহুদী ও নাসারাদের সিয়ামে কোনো পার্থক্য নাই। তাই সিয়াম পালনকারীকে অবশ্যই সাহারী খেতে হবে পরিমাণে কম হোক বা বেশি। এমনকী তা এক ঢোক পানিও হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের যে বিষয়গুলি জেনে রাখা আবশ্যক তা হল : (ক) সিয়ামের জন্য মুখে শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া বিদআত, কিন্তু ফযরের পূর্বে নিয়্যাত (মনের সংকল্প) করে নিতে হবে (আবূ দাউদ ১/৩৩৩, সানাদ সহীহ্)। (খ) মুমিনের উত্তম সাহারী হল খেজুর (ঐ হাদীস নং ২৩৪৫, সানাদ সহীহ্)। তাই আমাদের পছন্দনীয় খাবার খেয়ে ২/১টি খেজুর সুন্নাত মনে করে খাওয়া ভালো। (গ) গোসল ফরয হয়ে থাকা অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে, সেই অবস্থায় সাহারী খেয়ে গোসল করে ফজরের স্বলাত পড়তে হবে। এই অজুহাতে সিয়াম বাদ দেওয়া যাবে না (মুসলিম ১/৩৫৪)। (ঘ) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী সাহারী ও স্বলাতের মধ্যে ৫০টি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান পাওয়া যায়। এই হিসাবে ফজরের স্বলাতের ১৫/২০ মিনিট পূর্বে সাহারী খাওয়া শেষ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''আর তোমরা পানাহার কর সকালের কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত'' (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত নং ১৮৭)। (ঙ) বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানীর মতে সাহারীর জন্য সুন্নাতী আযান দেওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে যে ক্বিরাআত, গজল, বক্তব্য, সময়ের ঘোষণা ইত্যাদি করা হয় তা বিদআত (ফাতহুল বারী, বর্তমানে দেওবন্দের ছাপা ২য় খণ্ড ১৩৩ পৃঃ)। তাই এ সব কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৪) ইফতার : সারাদিন সিয়াম পালন করার পর সূর্যের বৃত্তের সম্পূর্ণ অংশ অদৃশ্য হবার সাথে সাথে যে পানাহার করা হয় তাকেই বলে ইফতার। এ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে, (ক) রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)। কারণ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইফতারে দেরী করে (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ১২৩ পৃঃ)। তাই ইফতারে দেরী করা মোটেই উচিৎ নয়। (খ) মাগরিবের স্বলাতের পূর্বেই ইফতার করতে হবে (তিরমিযী আবূ দাউদ, মিশকাত)। (গ) ইফতারের খাদ্য সামগ্রী সাজাতে, দাঁতন করাতে অথবা আজেবাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে সূর্যাস্তের ৫/১০ মিনিট পূর্বে খাদ্যাদি নিয়ে বসে ইফতারের মূল্যবান সময়ের কদর করা উচিৎ। (ঘ) খেজুর বরকতময় খাদ্য এবং সুন্নাতিও, তাই তা দিয়ে উফতার করে পছন্দনীয় খাদ্য খাওয়া উচিৎ; না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা ভালো (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ইত্যাদি)। (ঙ) অন্যকে ইফতার করালে সিয়াম পালনকারীর সমান সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় যে প্রথা ও লৌকিকতা দেখা যায় তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই (তিরমিযী হাঃ নং ৮০৬)। (চ) ইফতার শুরু করার জন্য দুআ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়নি, যেহেতু খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে হয়, তাই 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে ইফতার শুরু করতে হবে। ইফতার শেষে এই দুআটি বলা উত্তম 'যাহাবায্ যামাউ অবতাল্লাতিল উরূকু অসাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ্' (আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫৫৭)।

(৫) তারাবীহ : রমাযান মাসে রাতের নফল স্বলাত তারবীহ নামে পরিচিত। স্মরণে রাখতে হবে যে, (ক) তারাবীহ্, তাহাজ্জুদ, কিয়ামে রমাযান, স্বলাতুল লায়ল ইত্যাদি একই স্বলাতের ভিন্ন নাম। (খ) পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই এই স্বলাত জামাআতে আদায় করা উচিৎ। (গ) বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এশার পর হতে সুবহে সাদিক (ফজর স্বলাতের পূর্ব) পর্যন্ত ১১ রাকাআত পড়তেন (মুসলিম ৭৩৬, আবু দাউদ ১৩৩৬, নাসাঈ ৬৮৫, ইবনু মাজাহ্ ১৩৫৮, আহমাদ ২৪৫৩৭ ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থে প্রমাণ বিদ্যমান)। (ঘ) বুখারী হাঃ নং ২০১৩, মুসলিম হাঃ নং ৭৩৮ সহ বহু বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহের স্বলাত ১১ রাকাআতই পড়েছেন। যার মধ্যে ৮ রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত বিতর (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হানাফী ফিকাহ্ শরহে বেকায়া ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ্ আমাদেরকে হক জানা ও মানার তাওফীক দান করুন — আমীন।

(৬) শবে কদর : রমাযান মাসে মহান আল্লাহ্ বান্দাদেরকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন শবে কদর তার অন্যতম। আল্লাহ্ বলেন, ''লাইলাতুল কদরের ইবাদাত হাজার মাস বা ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম'' (সূরা কদর আয়াত নং ৩)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, '' রমাযানের শেষ দশক এলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কোমর শক্ত করে রাত জাগতেন ও তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন'' (বুখারী ২০২৪)। এ রাতের মর্যাদা বর্ণনাতীত। তবে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ হল : (ক) শবে কদর রমাযান মাসেই শেষ দশকে হয়। শেষ দশকের ব্যাখ্যায় মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা

শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে বেড়াও'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)। (খ) শবে কদরের সময়সীমা হল সূর্যাস্ত থেকে ফজরের সূর্যোদয় পর্যন্ত (সূরা কদর : ৫)। (গ) কুরআন অবতীর্ণের রাত শবে কদর অতি বরকতময়, কল্যাণময়, সালাম ও শান্তির বাহক। (ঘ) এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করা হয় (সূরা দুখান, আয়াত নং ৪)। (ঙ) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় কদরের রাতে কিয়াম (স্বলাত) করে তাঁর পূর্বেকার সমস্ত (সাগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়'' (বুখারী হাঃ নং ৩৫, মুসলিম হাঃ নং ৭৬০ ইত্যাদি)। (চ) স্বলাতের পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত সহীহ্ পদ্ধতিতে যিকির, দুআ, দরূদ ইত্যাদির মাধ্যমে রাতটি কাটানো উচিৎ। (ছ) এই রাতের বিশেষ দুআ হল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফাফু আন্নী' (তিরমিযী, মিশকাত ও অন্যান্য)। (জ) এ রাতের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, বাতাসের নিস্তব্ধতা, উল্কা না ছোটা, বৃষ্টির সম্ভাবনা সর্বোপরি মুমিন হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বস্তি ও শান্তি ইত্যাদি এর বিশেষ নিদর্শন। (ঝ) লোকমুখে প্রচলিত কুকুর শব্দ করে না, গাছপালা সাজদা করে, সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়-এসব কথা ভিত্তিহীন। (ঞ) যাঁরা এ রাতে ভোজের আয়োজন করেন, সাহারী পার্টি করে গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলে বেড়ান, কবরস্থানে গিয়ে জামাআতবদ্ধ হয়ে হাত তুলে দুআ করেন, সারা রাত মাইক বাজিয়ে অন্যের ইবাদাতে বাধা সৃষ্টি করেন তাঁরা শরীয়তের ধার ধারেন না। আল্লাহ্ এদের হিদায়েত দিন — আমীন।

(৭) ই'তিকাফ : ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ইবাদাতমূলক কাজে মগ্ন থাকাকেই ই'তিকাফ বলে। রমাযান মাসে সওয়াব লাভের জন্য যেসব কর্ম বিশেষভাবে তাকীদপ্রাপ্ত ই'তিকাফ তার অন্যতম। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিষয়গুলি হল : (ক) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নাবী হবার পর প্রতি রমাযানে বিশেষ করে এর শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর ২০ দিন ইতিকাফ করেন (বুখারী হাঃ নং ২০৪৪)। (খ) পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন (বুখারী হাঃ নং ২০২৬, মুসলিম হাঃ নং ১১৬৭)। তাই এর গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা প্রশ্নাতীত। (গ) রমাযানের প্রথম, মধ্যম ও শেষ দশকেও ইতিকাফ করা যায় (বুখারী ২০১৬, মুসলিম ১১৬৭)। (ঘ) ইতিকাফকারী মুসলিম, জ্ঞানসম্পন্ন, ভাল-মন্দের বোধ সম্পন্ন হবে এবং ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করবে — কমপক্ষে এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে। (ঙ) ইতিকাফকারী নিজেকে নফল ইবাদাত, স্বলাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, ইস্তিগফার, দরূদ, সালাম, দুআ ইত্যাদি ইবাদাতমূলক কাজে নিয়োজিত রাখবে। (চ) ইতিকাফ কারী নিতান্ত প্রয়োজনে জরুরী কথা বলতে পারেন, মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না, রুগী দেখা ও জানাযার স্বলাতে যাবেন না (সহীহ্ আবূ দাউদ হাঃ নং ২১৬০)। (ছ) অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাস করলে, মহিলাদের মাসিক বা নেফাস হলে, কথা ও কর্মের মধ্যে শির্ক ও কুফর হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যায়। (জ) যতটা সময়ের নিয়ত করা হয়েছিল তার পূর্বে ইতিকাফ ভঙ্গ করা যায় এক্ষেত্রে কাযা করতে হবে (বুখারী হাঃ নং ২০৩৩, মুসলিম হাঃ নং ১১৭৩)।

(৮) স্বলাত ত্যাগকারীর সিয়াম : রমাযান মাসে অনেক স্বলাত ত্যাগকারীকে সিয়াম পালন করতে দেখা যায়। অপ্রিয় সত্য কথা হল আল্লাহ্র কাছে এরূপ সিয়ামের কোনো মূল্য নেই। এ বিষয়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বহু হাদীসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : (ক) কিয়ামতের দিনে মুমিনদের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার স্বলাতের। স্বলাতের হিসাব সুষ্ঠু হলে বাকী আমলসমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সবকিছু নষ্ট ও বেকার হয়ে যাবে (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হাঃ নং ১৩৫৮, সহীহ্ জামে সাগীর হাঃ নং ২৫৭৩)। (খ) মানুষ ও শির্ক ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল স্বলাত ত্যাগ করা (মুসলিম হাঃ নং ৮২)। (গ) যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান তা হচ্ছে স্বলাত (পড়া)। অতএব যে স্বলাত ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে (তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ, মিশকাত সানাদ সহীহ্)। (ঘ) উক্ত হাদীসগুলিসহ পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫৪ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, শৈথিল্যের ও আলস্যের সাথে স্বলাত আদায়কারীর কোনো নেক আমল আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। তাহলে স্বলাত ত্যাগকারীর সিয়াম যে মূল্যহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (ঙ) শুধু তাই নয় যারা স্বলাতহীন সিয়াম পালন করেন তাঁরা কাবীরা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকে সিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেন। কারণ কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৮৩ নং আয়াতে সিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া তথা আল্লাহ্ ভীরুতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে যা স্বলাত ত্যাগ করে সম্ভবপর নয়। (চ) কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ''সুতরাং

কেউ অনু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে" (৯৯:৭)। কাজেই সিয়াম নামক আমল কেন বৃথা যাবে? সবিনয়ে তাদেরকে জানাই, ফেল করা ছাত্র/ছাত্রীরাও মার্কশিট পায় এবং তাদের প্রাপ্ত নম্বরও মার্কশিটে তারা দেখতে পায় কিন্তু তাদের এই মার্কশিট পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কোনোই কাজে আসে না। একই রকমভাবে স্বলাত ত্যাগকারী তার আমলনামায় সিয়ামের নেকী দেখতে পাবেন, কিন্তু সেই আমলনামা কোনো কাজে আসেব না—এটাই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ছ) যাঁরা স্বলাতহীন সিয়াম পালন করেন বা রমাযান মাস ছাড়া বাকী ১১ মাস স্বলাত পড়েন না তাঁদের উদাহরণ দিতে আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে থাকার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়" (সূরা নাহ্ল : ৯২)। তাই পাঠককূলের কাছে করজোড়ে নিবেদন— আসুন! আমরা আংশিকভাবে নয়, পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্র বিধানসমূহ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্দেশিত পথে মেনে চলি। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন — আমীন।

(৯) সিয়াম মুসলিমকে সংযমী বানায় : পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারায় ১৮৩ নং আয়াতে সংযমী হওয়া সিয়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় কীভাবে তা হয়? উল্লেখ্য যে, মানুষের সত্তা দুটি — শরীর বা নাফ্স এবং রূহ বা আত্মা। এর মধ্যে রূহ হল আসল মানুষ; নাফস নয়। কারণ কুরআন বলে প্রথম মানুষ আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর দেহ সৃষ্টি হবার পর এর মধ্যে আল্লাহ্ নিজে ফুঁ দিয়ে রূহ ঢুকিয়ে দিলেন। তাই আল্লাহ্র দেওয়া রূহটাই হল মানুষের আসল সত্তা এবং এটাই মনুষ্যত্ব। এর দ্বারাই আমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারি। অনেকে এটাকে বিবেক বা নৈতিক চেতনা বলেন। মানব দেহের কোনো নৈতিক চেতনা নাই। তাই এটি পশুর মতোই। দেহের দাবী হলো ক্ষিদে লাগলে খাদ্য, পিপাসায় পানি, গরমে ঠাণ্ডা ইত্যাদি চাওয়া। নাফসের যেহেতু কোনো নৈতিক চেনতা নাই ফলে সে কোনো মন্দ কাজ করতে চাইলে নৈতিক চেতনা সম্পন্ন রূহ তাতে বাধা দেয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মধ্যে নাফ্স ও রূহের মধ্যে সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামে যার রূহ যতবেশি শক্তিশালী সে ততভাল মানুষ। অপরপক্ষে রূহ যদি দুর্বল হয় তাহলে সে নাফসকে দমন করে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, তাই সমাজে সে খারাপ মানুষ বলে পরিচিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী কর্তব্য হল রূহকে শক্তিশালী করা। মানব শরীর মাটির উপাদানে তৈরি তাই মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য খেয়ে তা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে রূহ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত এক ঐশী শক্তি সেহেতু এর খাদ্য হল আল্লাহ্ প্রদত্ত অহীর জ্ঞান, যা না থাকলে রূহ দুর্বল হতে বাধ্য। ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় চড়ে লাগাম কষে যদি ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে অল্প সময়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু ঘোড়া যদি নিজের খেয়াল খুশি মত চলে তাহলে গন্তব্যস্থলে তো পৌঁছাবেই না। এমনকী সওয়ারীর মহাবিপদ টেনে আনবে। ঠিক তেমনি রূহ যদি ইসলামের লাগাম লাগিয়ে নাফ্সকে ঠিকমত চালাতে পারে তাহলে সে গন্তব্যস্থলে (জান্নাতে) পৌঁছাবে; অন্যথায় সে কুরআনে বর্ণিত, ''এরা পশুর মতো; বরং পশুর চেয়ে অধম" হয়ে জাহান্নামে যাবে।

তাই আমরা সচেষ্ট হব রূহকে এমন শক্তিশালী করতে যাতে সে নাফ্সকে দমন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা সিয়ামকে এক শক্ত হাতিয়ার হিসাবে আমাদের দান করেছেন। রমাযানে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। এই দুই ক্ষুধাকে দমন করতে পারলে নাফ্সকে দমন করা সহজ হয়ে যায়। সিয়াম ছাড়া এত দীর্ঘ সময় ধরে কিছু না খেয়ে মানুষ থাকে না। রমাযানের গোটা মাসটাই চলে একটানা কঠিন ট্রেনিং; এ যেন নাফস-এর দাবীকে অগ্রাহ্য করে রূহকে শক্তিশালী করার ট্রেনিং, আল্লাহ্র গোলাম হবার ট্রেনিং। মানুষকে ক্ষুধায় কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তুমি নাফসের গোলাম না হয়ে আমার গোলাম হও। তোমার দেহ যখন খেতে চায় তখনই তাকে খেতে দিবে না। আমি যখন খেতে বলি তখন খাও, যখন খাওয়া বন্ধ করতে বলি তখন বন্ধ কর। রমাযানে দুপুরের পর দেহ খেতে চায় কিন্তু সিয়াম পালনকারী তাকে খেতে দেয় না। তার ভাবখানা এমন হয় যে, আমি তোর গোলাম নই, আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্র গোলাম। আর আমার মনিবের হুকুম মতো সূর্যাস্তের পর খেতে পাবি তার আগে কোনো মতেই নয়।

এভাবে সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুসলিম দেহের দাবীকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ্র হুকুম পালনে অভ্যস্ত এবং সংযমশীল হয়। তাই কালেমার দাবী অনুযায়ী চলার যোগ্যতা অর্জনের এক চমৎকার ট্রেনিং এই সিয়াম।

পরিশেষে দুআ করি আল্লাহ্ যেন সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত হুকুম যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা দান করেন এবং আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন — আমীন।

তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ কি আলাদা ?

মূল ঃ হাফিয যুবাইর আলী যাঈ
অনুবাদক ঃ মহঃ মুসলেহুদ্দীন মাযহারী

মসলা ঃ আমাদের ইমাম আযম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এশার স্বলাতের পর থেকে ফজর স্বলাত পর্যন্ত এগারো (১১) রাকাআত পড়তেন।

দলীল নং — ১ ঃ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত—

كان رسول اللّٰه يصلى فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء و هى التى يدعو الناس العتمة الى الفجر احدىٰ عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين و يوتربو احدة.

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লাম) এশার স্বলাত সমাপ্তের পর ফজর পর্যন্ত এগারো রাকাআত পড়তেন এবং এই স্বলাতকেই লোকেরা 'আতামাহ্' বলত। তিনি প্রত্যেক দু রাআকাতে সালাম ফিরতেন এবং এক (রাকাআত) বিতর পড়তেন (সহীহ্ মুসলিম ১/২৫৪, হাঃ ৭৩৬)।

দলীল নং — ২ ঃ আবু সালামাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞাসা করেন, রমাযান মাসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্বলাত কেমন ছিল ? তিনি বলেন —

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগারো রাকাআতের অধিক স্বলাত আদায় করতেন না (সহীহুল বুখারী ১/২৫৬, হাঃ ২০১৩, উমদাতুল কারী ১১/১২৮, কিতাবুস্ সাওম, কিতাবুত্ তারাবীহ্, বাবু ফাযলী মান কামা রমাযান)।

একটি অভিযোগ ঃ এই হাদীসের সম্পর্ক তাহাজ্জুদের সাথে।

উক্ত অভিযোগের জবাব ঃ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্, কিয়ামুল লায়ল, কিয়ামে রমাযান এবং বিতর একই স্বলাতের বিভিন্ন নাম।

দলীল নং — ১ ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্ আলাদ আলাদা পড়ার প্রমাণ নেই।

দলীল নং — ২ ঃ মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও অন্যান্য বিদ্বানরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসকে নিয়ে কিয়ামে রমাযান এবং তারাবীর অধ্যায় রচনা করেছন যেমন —

১। সহীহুল বুখারী কিতাবুস সাওম কিতাব নং ৩৬, কিতাব স্বলাতিত্ তারাবীহ্ কিতাব নং ৩৭)।

২। মুয়ত্তা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী পৃষ্ঠা নং ১৪১, বাবু কিয়ামি শাহ্রি রমাযান অমা ফীহি মিনাল ফাযল-এর টীকায় আব্দুল হাঈ লক্ষ্ণৌভী বলেন —

قوله قيام شهر رمضان و يسمى التراويح

অর্থাৎ কিয়ামে রমাযান যাকে তারাবীহ্ বলা হয়।

৩। আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী (২/৪৯৫) বাবু মা রুভেয়া ফী আদাদি রাক্আতিল কিয়াম ফী শাহ্রি রমাযান।

দলীল নং — ৩ ঃ মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বের) কোনো মুহাদ্দিস কিংবা ফাক্বীহ একথা বলেননি যে, এই হাদীসের সম্পর্ক তারাবীর সঙ্গে নেই।

দলীল নং — ৪ ঃ এই হাদীসকে বেশ কিছু বিদ্বান কুড়ি (২০) রাকাআতের জাল ও মুনকার হাদীসের বিপরীতে বর্ণনা করেছেন। যেমন —

(১) আল্লামাহ্ যায়লাঈ হানাফী (নাসবুর রায়াহ্ ২/১৫৩)।

(২) হাফিয ইবনু হাজার আস্কালানী (আদ্ দিরায়াহ্ ১/২০৩)।

(৩) আল্লামাহ্ ইবনু হুমাম হানাফী (ফাতহুল কাদীর ১/৪৬৭)।

(৪) আল্লামাহ্ আইনী হানাফী (উমদাতুল কারী ১১/১২৮)।

(৫) আল্লামাহ্ সুয়ূতী (আলহাবী লিল ফাতাওয়া ১/৩৪৮)।

দলীল নং — ৫ ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শুধুমাত্র কিয়ামে রমাযান সম্পর্কিত ছিল। যাকে তারাবীহ বলে, তাহাজ্জুদের স্বলাতের ব্যাপারে প্রশ্নকারীর প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রশ্নের উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কিয়ামে রমাযান ও রমাযান ছাড়া অন্য সময়েরও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুতরাং এই হাদীসে এগারো (১১) রাকাআত তারাবীর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

দলীল নং — ৬ ঃ যাদের দাবী যে, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা স্বলাত, তাদের উসূল অনুযায়ী নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ২৩ রাকাআত তারাবীহ্ (২০+৩) পড়েছেন, যেমনটি তাদের আমল এবং ঐ রাত্রেই এগারো (১১) রাকাআত

তাহাজ্জুদ পড়েছেন (৮+৩) যেমনটি তাদের নিকট সহীহ্ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এখানে একটি বিষয়ের সমস্যা হল যে, তিনি তাহলে একই রাত্রিতে দু'বার বিতর পড়েছেন। তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাহলে বলেন যে—

لَا وِتْرَانِ فِى لِيلة (صحيح الاسناد)

অর্থাৎ — একই রাত্রে দুটি বিতর নেই (তিরমিযী হা/৪৭০, আবু দাউদ হা/১৪৩৯, সহীহ্ ইবনু খুযায়মাহ্ হা/১১০১, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা/৬৭১)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা এবং কর্মে বৈপরিত্য হতেই পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রাত্রে একটিই বিতর পড়েছেন। তাঁর থেকে শুধু এগারো রাকাআত (৮+৩) প্রমাণিত। তেইশ (২০+৩) প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ তেইশ এবং এগারোর বর্ণনায় শুধুমাত্র এগারো রাকাআতের বর্ণনাই প্রমাণিত।

অতএব তাহাজ্জুদ এবং তারাবীর মধ্যে পার্থক্য করা বাতিল বা ভিত্তিহীন।

দলীল নং — ৭ ঃ আনওয়ারশাহ্ কাশ্মিরী দেওবন্দী স্বীকার করেছেন যে, তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ্ একই স্বলাত এবং উভয় (স্বলাতের) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই (ফায়যুল বারী ২/৪২০, আল্ আরফুশ শাযী ১/১৬৬)। এটা বিরোধীদের ঘরের সাক্ষী। কাশ্মিরী সাহেবের এই কথার জবাব এখনো কোনো দিক থেকে আসেনি।

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.

অর্থাৎ ঃ এই ঘরে আগুন লেগেছে ঘরেরই প্রদীপে।

দলীল নং — ৮ ঃ আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্কে একই মনে করতেন (বিঃ দ্রঃ ফায়যুল বারী ২/৪২০)।

দলীল নং — ৯ ঃ কিছু বিদ্বান ওই ব্যক্তিকে তাহাজ্জুদ পড়তে নিষেধ করেন যে তারাবীর স্বলাত পড়েছে (কিয়ামুল লাইল লিল মারূযী, ফায়যুল বারী সহ ২/৪২০)।

এটা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, এই সমস্ত বিদ্বানদের নিকট তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ্ একই স্বলাত।

দলীল নং — ১০ ঃ জাবির বিন আব্দিল্লাহ্ আল্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত —

صلى بنا رسول الله ﷺ فى رمضان ثمان ركعات و الوتر.

অর্থাৎ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদেরকে আট (৮) রাকাআত এবং বিত্র পড়িয়েছেন (সহীহ্ ইবনে খাযায়মাহ্ ২/১৩৮ হাঃ/১০৭০, হিব্বান (আল ইহসান) হাঃ/২৪০১, ২৪০৬)।

অবশ্যই এই হাদীস তারাবীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

উক্ত হাদীসকে ইবনু খুযায়মাহ ও ইমাম হায়সামী হাসান বলেন এবং ইমাম বুসীরী যাওয়াইদি সুনান ইবনু মাজাহ্ হা/৪২৪১ হাসান বলেছেন।

দলীল নং — ১১ ঃ উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত, আমি রমাযানে আট (৮) রাকাআত এবং বিত্র পড়ার কথা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললে তিনি চুপ থাকলেন। **فكانت سنة الرضا** সুতরাং এটি সমর্থনের সুন্নাত হয়ে গেল (অর্থাৎ মৌন সম্মতির সুন্নাত) (মুসনাদ আবু ইয়ালা ৩/২৩৬ হা/১৮০১)। এই হাদীসটি হাসান (মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৭৪)।

সারফরায খান সফদর দেওবন্দী লিখেছেন, যদি ইমাম হাইসামীর সহীহ্ ও যঈফ নির্ণয় না হয় তাহলে কার ছিল? (অর্থাৎ ইমাম হাইসামীর সহীহ্ ও যাঈফ বলা সঠিক। অতএব উক্ত হাদীসকে ইমাম হাইসামীর হাসান বলা — সফদর দেওবন্দীর নিকট গ্রহণযোগ্য— আল্ হামদুলিল্লাহ্ — অনুবাদক)।

দলীল নং — ১২ ঃ আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই বিন কাব ও তামীম আদ দারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, লোকেদেরকে (রমাযানের রাত্রে) এগারো রাকাআত পড়ানোর (মুয়ত্তা ইমাম মালিক হা/২৪৯, বায়হাক্বী ২/৪৯৬)। সর্বসম্মতিক্রমে হাদীস সহীহ্।

দলীল নং — ১৩ ঃ ইবনু হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেন, রমাযানের রাত্রে জামাআতে নফল স্বলাত পড়াকে তারাবীহ বলা হয়েছে (ফাতহুল বারী সহ, বুখারীর উর্দূ শারাহ্ দাউদ রায ৩/২৪২)।

আল্লামাহ্ উবাইদুল্লাহ্ রহমানী মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই স্বলাত (মিরআতুল মাফাতীহ্ ৪/৩১১, হা/১৩০২ এর ভাষ্য)।

তিনি আরো বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদের রাকাআত সংখ্যার কোনো

পার্থক্য ছিল না (মিরআত ৪/৩২১)। তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই স্বলাত (ফাতাওয়া শাবকাতিল ইসলামিয়্যাহ্ ৬/৬০৪)।

আল্লামাহ্ ইমরান আইয়ূব লাহোরী (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কিয়ামুল লায়ল, কিয়ামে রমাযান এবং তারাবীহ্ একই স্বলাতের বিভিন্ন নাম (ফিক্বহুল হাদীস ১/৪৬৯)।

রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলেন, কোনো বিদ্বান এ বিষয়ে অজ্ঞাত নন যে, কিয়ামু রমাযান (তারাবীহ্) ও কিয়ামুল লায়ল প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস। রমাযানে শুধুমাত্র মুসলিমদের সুবিধার্থে প্রথম রাতে পড়া হয় ... ইত্যাদি আর তা হল ১১ রাকাআত (আল্ হাক্কুস সারীহ্ ফী ইসবাতিত্ তারাবীহ্ ফারসী ১ পৃঃ)।

আহমাদ ইয়ার নায়ীমী বেরেলী হানাফী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জাআল হাক্ব এ মাদারিজুন নাবুওয়াহ্ ১/৪০০ এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন যে, মৌলভী আব্দুল হক্ব হানাফী এগারো রাকাআত তারাবীহ্ স্বীকার করতেন। তারপর তিনি লেখেন যে, হক বা সত্য হল এটাই যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযানে ওই এগারো রাকাআত স্বলাতই পড়তেন যা তিনি সাধারণ অবস্থায় সর্বাবস্থায় তাহাজ্জুদের স্বলাত পড়তেন। অতিরিক্ত তিনি আরো বলেন যে, সঠিক মসলা বা সঠিক কথা হল এটাই যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তিনি এগারো রাকাআতই পড়তেন যেমনটি তাঁর কিয়ামুল লায়লের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদে) অভ্যাস ছিল (মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্ ২১৭ পৃঃ)।

এটা থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর নিকটেও তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ স্বলাত একই (তারাবীহ্ কা মুকাদ্দামাহ্ হানাফী ফুক্বাহা কী আদালাত মে ১০ পৃঃ)।

হাফিয সালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহঃ) বলেন, তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই স্বলাত। প্রশ্নকারীর উত্তরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমাযানের বাইরে হোক বা রমাযানে তিনি এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, রমাযান ছাড়া রাতের স্বলাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) এগারো রাকাআতই পড়তেন (রমাযানুল মুবারক ৫১ পৃঃ)।

আবু আদনান মুহাম্মাদ মুনীর কামার (রহঃ) বলেন, কিয়ামুল লাইল, কিয়ামে রমাযান, স্বলাতুল লাইল, তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ্ একই স্বলাতের বিভিন্ন নাম (রমাযান, রোযা ও যাকাত ১১ পৃঃ)। মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ আফীফ (রহঃ) বলেন, তারাবীর স্বলাতের পর দ্বিতীয়বার তাহাজ্জুদের জামাআত বা নফল আদায় করা প্রমাণিত নয় (ফাতাওয়া হাফ্ত রোয আহ্লে হাদীস লাহোর ২০ খণ্ড, সংখ্যা নং ২১, হিজরী ১৪০৯, খ্রীঃ ১৯৮৯)।

আল্লামাহ্ ইকবাল কীলানী (রহঃ) বলেন, কিয়ামে রমাযান অথবা স্বলাতে তারাবীহ্ বাকী মাসে তাহাজ্জুদ অথবা কিয়ামুল লাইল এর দ্বিতীয় নাম (রোযা কী মাসায়েল ৩৫ পৃঃ)।

আবু আদনান মুনীর কামার বলেন, ডঃ আল্লামাহ্ মুকতাদা হাসান আযহারী (রহঃ) বলেন, একদল বলেন য, তারাবীহ্ প্রথম রাত্রে পড়া হয় এবং তাহাজ্জুদ শেষ রাত্রে। কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল। তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ্র সময় সম্পূর্ণই এক। তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্ কখনো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রথম রাত্রে, কখনো মধ্য রাত্রে আবার কখনো শেষ রাত্রে পড়তেন (বিস্তারিত দেখুন স্বলাতে তারাবীহ্ ২৫-২৯)। অর্থাৎ তাঁর নিকটেও তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই স্বলাত।

আল্লামাহ্ মুহিব্বুল্লাহ্ শাহ্ রাশিদী বলেন, তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই স্বলাত এবং তা শুধুমাত্র ১১ রাকাআত (মাকালাত রাশিদিয়্যাহ ২০০-২০৮)।

আল্লামাহ্ আবুল হাসান মুবাশ্শার আহমাদ রব্বানী বলেন, কিয়ামে রমাযান, কিয়ামুল লাইল এবং তারাবীহ্ একই স্বলাত (সলাতুল মুসলিম ৫৭ পৃঃ)।

তিনি আরো বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুহাম্মাদ শাকির, আবু হানীফা, ইমাম বায়হাক্বী, আল্লামাহ্ যাইলায়ী হানাফী, আল্লামাহ্ ইবনু হুমাম এবং হাসান শায়বানী তারাবীহ্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যা থেকে স্পষ্ট ভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ একই জিনিস (বিস্তারিত দেখুন মাকালাতে রব্বানী ৩২-৩৭ পৃঃ)।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামে রমাযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবীর স্বলাত।

ইবনু হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেন, তারাবীহ্র দ্বারা রমাযানের ক্বিয়ামের উদ্দেশ্য হাসিল হবে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, তারাবীহ্ ব্যতীত কিয়ামে রমাযান হবে না।

আল্লাম্মাহ্ কিরমানী (রহঃ) বলেন, সকলের ঐক্যমত রয়েছে যে, কিয়ামে রমাযান দ্বারা তারাবীহের স্বলাতই উদ্দেশ্য। **تراويح** শব্দটি **ترويحة** এর বহুবচন যার অর্থ বিশ্রাম নেওয়া। রমাযানের রাত্রিগুলিতে জামাআতবদ্ধ স্বলাতের নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ্। কেননা যারা কিয়ামে রমাযানের ১ম জামাআত করেছেন তাঁরা প্রতি দু সালামের মাঝে বিশ্রাম নিতেন। ফাতহুল

বারীতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছ। আল্ ক্বামূস-এ রয়েছে যে, প্রতি চার রাকাআতের পর বিশ্রামের কারণে রমাযানের কিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ্। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রাতের চার রাকাআত স্বলাত আদায়ের পর বিশ্রাম নিতেন ..... (বায়হাক্বী ২/৪৯৭)।

তবে জেনে রাখতে হবে যে, রমাযানের তারাবীহ্, কিয়ামে রমাযান, সলাতুল লায়ল, তাহাজ্জুদের স্বলাত এগুলো একই জাতীয় ইবাদাত এবং একই স্বলাতের ভিন্ন নাম। রমাযানের তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্ ভিন্ন স্বলাত নয়। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে কোনও সহীহ্ অথবা যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযানের রাত্রে দুটি স্বলাত আদায় করেছেন যার একটি তারাবীহ্ ও অপরটি তাহাজ্জুদ। সুতরাং রমাযান ছাড়া অন্য মাসে যা তাহাজ্জুদ, রমাযানে তা তারাবীহ্। যেমন আবু যার ও অন্যান্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তার দলীল এবং হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফায়যুল বারী গ্রন্থ প্রণেতা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট পছন্দনীয় মত হল তারাবীহ্ এবং রাতের স্বলাত একই যদিও উভয়ের গুণাবলী ভিন্ন। যাই হোক, উবায়দুল্লাহ্ রহমানী মুবারকপুরী মিরআত প্রণেতা বলেন, ''আমি বলব যে, তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ্ একই স্বলাত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহাজ্জুদটি শেষ রাতের সাথে নির্দিষ্ট। তবে আমার নিকট উত্তম কথা হল যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অধিকাংশ রাতের স্বলাত ছিল রাতের শেষাংশে (মিরআতুল মাফাতীহ্ ৪/৩১০, হা/১৩০২ এর ভাষ্য, কিতাবুস স্বলাত, বাবু কিয়ামি শাহ্রি রমাযান)।

১১ মাস যার নাম তাহাজ্জুদ রমাযানে তারই নাম তারাবীহ্। যেমন কোনো হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ দুই-ই পড়েছেন; তেমন কোনো হাদীসে একথাও প্রমাণিত হয় না যে, তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদ দুটো আলাদা আলাদা স্বলাত (আমার নামায কি শুদ্ধ হচ্ছে! সংকলন মুহাম্মাদ আবু হেনা, সম্পাদনায় আকরামুয যামান বিন আব্দুস সালাম)।

সিয়াম ব্রতের কতিপয় বিধান

মহম্মদ শব্দর

রোযা কথাটির আরবী শব্দ সওম; তার বহুবচন সিয়াম। সিয়াম কথাটির অর্থ হল কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সক্ষম নরনারীকে (শারয়ী কারণ ছাড়া) সূর্য উদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পানাহার, সঙ্গম ও যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকাকে সওম বলে। এখানে শারয়ী কারণ বলতে নারীদের হায়েজ, নেফাস, অতিবৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবর্তী, দুগ্ধবতী নারী, সফর, অসুস্থতাকে বুঝানো হয়েছে। সওম পূর্বেকার নাবীদের উপর ফরয ছিল যা আমাদের উপর ফরয রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর যাতে করে তোমরা আল্লাহ্ভীরু হতে পার" (২/১৮৩)।

সিয়ামের প্রকারভেদ ঃ সিয়াম তিন প্রকার (১) ফরয বা বাধ্যতামূলক সম্পূর্ণ রমাযান মাস সিয়াম রাখা। (২) নফল (ঐচ্ছিক) ঃ সিয়াম পালন করলে নেকী পাওয়া যায়, না পালন করলে গোনাহ্ নেই। যেমন মুহার্রম মাসের ৯,১০ তারিখে আশুরার সিয়াম, ঈদুল ফিতরের পর শওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম, আরাফার দিনের সিয়াম, প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের সিয়াম ইত্যাদি। (৩) ওয়াজিব ঃ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট মানতের ও কাফ্ফারার সিয়াম।

সিয়ামের নিয়ম ঃ রমাযান মাসের চাঁদ উঠলে ১লা রমাযান ফরয সিয়াম শুরু হয়। সিয়ামের নিয়াত করবে এবং সুবহে সাদেকের পূর্বে সাহারী খাবে। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাবার খাওয়া, সকল প্রকার অশ্লীল কাজ, পর নিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা, মিথ্যাচার, স্ত্রী সহবাস, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে সূর্যাস্ত গেলে অতি সত্তর ইফতার করতে হবে। এ সম্বন্ধে আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের কেউ সওম পালন করলে অশ্লীল কথাবার্তা, অশালীন অলোচনা থেকে দূরে থাকবে। অতএব হে রোযাদারগণ যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা তোমার সাথে অভদ্রতা করে তা হলে বল আমি রোযাদার,

আমি রোযাদার" (মুসলিম ১১৫১)।

সওম রাখার হারাম দিন ঃ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন সিয়াম রাখা হারাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দুই দিন সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন (বুখারী ১৯১১, মুসলিম ২৫৪০)। তাশরিকের দিন অর্থাৎ ঈদুল আযহার পরে তিন দিন সিয়াম রাখা হারাম (মুসলিম ১৯২৬, বাবু তাহরীমে আইয়্যামে তাশরীক)।

রমাযানের চাঁদ দেখা ঃ চাঁদের সাথে আরবী মাস সম্পর্কযুক্ত। সেই জন্য আরবী মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয়। শাবান মাস শেষ হলে রমাযান। রমাযান মাসের চাঁদ উঠলেই সিয়াম শুরু হয়। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যদি দুই জন মুসলিম ব্যক্তি (চাঁদ দেখার) সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তোমরা সিয়াম রাখ। যদি চাঁদের ২৯ দিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে চাঁদ না দেখা যায় তবে ৩০ দিন পূরণ করে রোযা রাখবে বা ভাঙ্গবে" (নাসায়ী ২১১৬)। ইবনু উমার বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন রমাযানের নতুন চাঁদ তোমরা দেখবে তখন তোমরা সিয়াম রাখবে আর যখন (শওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম হতে বিরত থাকবে। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায় তবে চাঁদের গণনা (৩০দিন) পূরণ করবে" (বুখারী ১৯০০, মুসলিম ১০৮০)।

সাহারী ঃ সাহার শব্দের অর্থ হল সুবহে সাদেকের পূর্ববর্তী সময়। এই সময় কিছু খেয়ে সিয়ামের নিয়াত করতে হয়। আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে" (বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, সহীহ্ ইবনে মাজাহ্, সহীহ্ নাসাঈ ২১৪৬)। সাহারী বরকতপূর্ণ খাবার, ক্ষিদে থাক বা না থাক এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহারী খাওয়া উচিৎ। ইরবায বিন সারিয়াহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে সাহারী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, ''বরকতময় খানার দিকে এসো" (আবু দাউদ ২৩৪৪, নাসাঈ, সহীহ্ ইবনে হিব্বান)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা সাহারী খাও, যদি তা এক ঢোক পানি দিয়েও হয়" (সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৩৪৭৬)।

খাওয়ার পরিমান, সময় ও নিয়াত ঃ অতি সামান্য পরিমাণ (এক ঢোক চা, দুধ, পানী, বিস্কুট বা খেজুর) খাবার খেলে বা পান করলে সাহারী খাওয়ার সুন্নাত পালিত হবে এবং বিরাট ফরয সিয়াম পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে শক্তি পাবে ও ফেরেস্তার দুআ থেকে বঞ্চিত হবে না।

সাহারী খাওয়ার সময় অর্ধেক রাতের পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত। তবে শেষ সময়ে সাহারী খাওয়া উত্তম। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যায়েদ বিন সাবিত জানিয়েছেন যে, তারা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাহারী খেয়ে (ফজরের) স্বলাত পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহারী খাওয়া ও আযানের মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? উত্তরে যায়েদ বললেন, ৫০/৬০টি আয়াত পড়ার মত সময় (বুখারী ৫৭৫, মুসলিম ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩)।

সাহারী অনেক আগে খাওয়া উচিত নয়। সাহারী খাওয়ার পর ঘুমানো মোটেই উচিত নয়। ফজরের স্বলাত ছুটে যাবে বা কাযা হয়ে যাবে। এ ধরণের কাজে অনেকে ফেঁসে যায়। আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত দান করুন। ফজরের স্বলাতের পূর্বে মনে মনে সিয়ামের নিয়াত করতে হবে। এ সম্বন্ধে উম্মুল মুমিনীনা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ফজরের আগে সিয়ামের নিয়াত করবে না তার সিয়াম (সিদ্ধ) নয়" (আবু দাউদ ২৪৫৪, নাসাঈ ২৩৩১,তিরমিযী ৭৩০, ইবনে মাজাহ্ ১৭০০)।

স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাসের কারণে ফরয গোসলের সময় না থাকলে গোপনাঙ্গ ভাল করে ধুয়ে অযু করে সাহারী খেয়ে সিয়াম রাখা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের যা লিখে রেখেছেন কামনা কর। তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ রাত্রির কালো রেখা হতে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না পায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর" (২/১৮৭)। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে নাপাক অবস্থায় সিয়াম করা যায়। আল্লাহ্ ফজরের স্বলাত পর্যন্ত সহবাসের অনুমতি দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও উম্মু সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্ত্রী সহবাসের পর নাপাক অবস্থায় ভোর করতেন ও সিয়াম রাখতেন (বুখারী ১৯৯১, মুসলিম ১১০৯)। সাহারী খাওয়ার প্রাক্কালে ফজরের আযান হলে খাওয়া বন্ধ করতে হবে না, পেট

পুরে খাবেন। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন তোমাদের কেউ এমতাবস্থায় (ফজরের) আযান শুনতে পায় যে, পাত্রটি (খাবার সহ) তার হাতেই রয়েছে তবে সে যেন খাবার কাজ পূর্ণ না করেই রেখে না দেয়'' (আবু দাউদ ২৩৫০, তাহক্বীকে আলবানী)।

সওম ভঙ্গের কারণ ঃ সওম নষ্ট হওয়ার কারণ দুই প্রকার। (১) সওম নষ্ট হলে তার পরিবর্তে কাযা সওম করতে হয়, (২) সওম কাযা করার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজেব হয়ে যায়।

যে কারণে সওম নষ্ট হয়ে কাযার সাথে কাফ্ফারা ও ওয়াজেব হয় —

স্ত্রী সহবাস ঃ সওম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে সওম নষ্ট হয়ে যায়, তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক। বলা বাহুল্য, স্ত্রীর পায়ুতে সঙ্গম করা মহাপাপ এবং এক প্রকার কুফরী। এর ফলে সওম বাতিল হবে, কাবীরা গুনাহ্র জন্য তওবা করতে হবে। ঐ দিন তার পানাহার বন্ধ থাকবে। ঐ দিনের সওম কাযা করতে হবে তার সাথে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তা হল ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে, তাতে সক্ষম না হলে লাগাতার দুই মাস সওম পালন করতে হবে তাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে হবে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে সঙ্গম হলে উভয়ের জন্য কাফফারা ওয়াজেব। নফল সওম অবস্থায় সঙ্গাম করলে কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। সওম অবস্থায় সঙ্গম না করে স্ত্রীর যোনীর বাইরে বীর্যপাত করে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। অবশ্য কাযা করতে হবে।

নিম্নলিখিত কারণে সওম নষ্ট হলে সওম কাযা ওয়াজেব হবে কাফ্ফারা লাগবে না। **(ক) পানাহার ঃ** পেটের মধ্যে যে কোনো প্রকার খাদ্য অথবা পানীয় দ্রব্যাদি পৌঁছানোকে বুঝানো হয়েছে। তা মুখ বা নাক দিয়ে যে কোন খাবার পানীয়, সেটা হারাম বা হালাল হোক, অল্প বা বেশি হোক বা বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, খৈনী, গুটকা ইত্যাদি যা সওম নষ্ট করে। **(খ) বীর্যপাত ঃ** জাগ্রত অবস্থায় যৌন স্বাদ অনুভূতির সাথে বীর্যপাত সেটা হস্তমৈথুন, কোলাকুলি, চুম্বন বা প্রপাচন (সকল জিনিসই যৌনাচার) দ্বারা হলে সওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন সওম কাযা করতে হবে। বীর্যপাত ঘটানো যে কোনো মাসে হারাম। রমাযান মাসের পৃথক মর্যাদা রয়েছে। **(গ) ইচ্ছাকৃত বমি ঃ** মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সওম অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না তার জন্য কাযা নাই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে সে যেন ঐ সওম কাযা করে'' (আহমাদ ২/৪৯৮, আবু দাউদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭২০)। **(ঘ) যা অন্য অর্থে পানাহার ঃ** সওম অবস্থায় দেহে স্যালাইন বা রক্ত পরিবর্তন করলে বা রক্তের সাথে অন্য ঔষধ বা বস্তু থাকলে সওম হবে না। (ঙ) মহিলাদের মাসিক বা নিফাসের রক্ত বের হতে শুরু হলে তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে। (চ) নিয়ত বাতিল করলে সারাদিন পানাহারাদি না করলেও সওম বাতিল হয়ে যাবে। (ছ) কাফের হওয়া ঃ কোনো সওম পালনকারী কাফের হলে তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে। (জ) বেহুঁশ হলে সওম হবে না।

নিফাস ও মাসিক ব্যতীত সকল জিনিস কেবল তখনই সওম নষ্ট করবে যখন সে জানবে সেই জিনিস ঐ সময়ে ব্যবহার করলে তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু ইচ্ছাকৃত করলে অপরাধ আছে'' (৩৩/৫)।

সওম অবস্থায় যা বৈধ ঃ (ক) দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, চোখে, কানে, দাঁতে ঔষধ ব্যবহার। (খ) পানিতে নামা, ডুব দেওয়া, সাঁতার কাটলে সওম নষ্ট হবে না। (গ) পায়খানার দ্বারে ঔষধ, জ্বর মাপা যন্ত্র ব্যবহার করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। অনুরূপ পেটে (এন্ড্রোসকপি মেশিন) নল সঞ্চালন করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে নলের সাথে কোনো তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করলে সওম নষ্ট হবে। (ঘ) ভুল করে পানাহার করে জানতে পারার সাথে সাথে যা মুখে ছিল বের করে কুলি করে নেওয়া উচিৎ। সে যদিও পেট পুরে খেয়ে নেয় তবুও তার সওম হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত করলে অপরাধ আছে'' (৩৩/৫)। (ঙ) লবণ বা মিষ্টি চাখা, (চ) সাহারীর শেষ পর্যন্ত পানাহার করা, (ছ) ফজর উদয় হওয়ার পরও নাপাক থাকা (জ) দিনে ঘুমানো, (ঝ) ঢোক গিলা, (ঞ) সফর করা, (ট) সওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন বা আলিঙ্গন করলে সওম নষ্ট হয় না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ''নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সওম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন ও আলিঙ্গান করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে অধিক আত্ম সংযমশীল'' (বুখারী ১৯২৭, মুসলিম ১১০৬)। যারা সংযত থাকতে পারবেন তারা

(বয়স্করা) চুম্বন করবেন। যারা সংযত হতে পারবেন না তাদের ঐ পথে না যাওয়ায় ভাল। (ঠ) সওম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে বা চোঁয়া ঢেকুর হলে সওম ভঙ্গ হবে না। (ড) কিডনী অচল অবস্থায় দেহ পরিশুদ্ধ করার পর পুনরায় ফিরিয়ে দিতে যদি রক্ত দেহ থেকে বের হয় তবুও সওমের ক্ষতি হবে না। (ঢ) মাথা ন্যাড়া করা, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া, সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। (ন) রাস্তার ধুলো নাকে গেলে, নাকে মুখে স্প্রে, ঔষধ স্প্রে করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না।

রমাযান মাসে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা সওম তার উত্তরাধিকারীকে পূরণ করতে হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা সওম তার উত্তরাধিকারীকে পূরণ করতে হবে'' (বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭)।

ইফতার ঃ ইফতার কথাটির অর্থ ভেঙে দেওয়া। সারাদিন সওমের শেষে সূর্যাস্তের পর কিছু খাওয়ার মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। আল্লাহ্ বলেন, ''অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সওম পূর্ণ কর'' (২/১৮৭)। অর্থাৎ দিনের শেষে রাত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করো, দেরি কোরো না। ইফতারের সময় সম্বন্ধে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন রাত ঐদিকে থেকে আসে এবং দিন ঐদিকে চলে যায় এবং সূর্য অস্তমিত হয় তখনই সওম পালনকারীর ইফতারের সময়'' (বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, আবু দাউদ ২৩৫১, তিরমিযী ৬৯৮)। সূর্যাস্তের পর অতি সত্তর সওম ইফতার সম্বন্ধে সাহাল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লোক যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে'' (বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮)।

ইফতারের খাদ্য ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বলাত আদায়ের পূর্বে কিছু সংখ্যক টাটকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, টাটকা খেজুর না থাকলে কিছু শুকনো খেজুর (খুরমা) দিয়ে, শুকনো খেজুর না থাকলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন (তিরমিযী ৬৯৬)।

কোনো ব্যক্তি সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করালো তার জন্য দুআ ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অন্যের নিকট ইফতার করলে বলতেন, ''তোমাদের নিকট সওম পালনকারীগণ ইফতার করলেন এবং সৎলোকেরা তোমার খাদ্য ভক্ষণ করলেন। আর ফিরিস্তারা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন'' (সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ ১৭৪৭)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি কোনো সওম পালনকারীকে ইফতার করালো তার জন্য উক্ত সওম পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে অথচ উক্ত সওম পালনকারীর সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না (তিরমিযী ৮০৭, সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ ১৭৪৬)।

রমাযান মাসে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করা অতি আবশ্যিক ঃ মহাত্ম্যপূর্ণ রমাযান মাস অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, ''তা গোনা গাঁথা কয়েকটি দিন'' (২/১৮৪)। এই অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত বেশি সওয়াব অর্জন সম্ভব করতে হবে। এই সংকীর্ণ সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এই সুবর্ণ সুযোগ পুনরায় পাওয়া যাবে না। মর্যাদা ও নেকীর দিক থেকে আমল সমূহের তারতম্য রয়েছে। প্রত্যেক আমলকে পূর্ণাঙ্গ ও সুনিপুন করার জন্য যথাযথ প্রয়াস চালাতে হবে। তারপরে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকতে হবে।

(ক) দান করতে হবে যার সওয়াবের পরিমাণ হবে সত্তর গুণ। আল্লাহ্ বলেন, ''যারা আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে বলে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দান করে ..... '' (২৩/৬০)।

(খ) তারাবীহ্র স্বলাত নারী পুরুষ সকলের জন্য সুন্নাত। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিয়ামে রমাযানের ব্যাপারে (সকলকে) উৎসাহিত করতেন, কিন্তু বাধ্যতামূলক রূপে আদেশ দিতেন না। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান রেখে সওয়াবের আশায় রমাযানের কিয়াম করবেন, সে ব্যক্তির পূর্বকৃত (সাগীরা) পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে'' (আহমাদ ২/২৮১, ৫২৯, বুখারী ১৯০১)।

(গ) কুরআন তেলাওয়াত ঃ জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) রমাযান মাসের প্রত্যেক রাতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও তাঁকে কুরআন পাঠ করাতেন (বুখারী ৬, মুসলিম ২৩০৮)। এ হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, রমাযান মাসে বেশি বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। রাত্রিতে ব্যস্ততা থাকে না, মনের একাগ্রতা থাকে। তার জন্য রাত্রিতে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, ''অর্থাৎ নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ মনের একাগ্রতা ও হৃদয়ঙ্গমের জন্য অতিশয় অনুকুল'' (৭৩/৬)। কুরআন না বুঝে, না অনুধাবন করে

তেলাওয়াত করা উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন, ''আমি এ বরকতময় কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে''(৩৮/২৯)। তাছাড়া প্রতিটি অক্ষরে একটি করে নেকী রয়েছে।

(ঘ) উমরা করা রমাযান মাসে বড় ফযিলতের কাজ। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে বেশি। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অবশ্যই রমাযান মাসে উমরাহ্ একটি হজ্জ অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতূল্য'' (বুরী ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬)।

(ঙ) ইতিকাফ ঃ ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হল কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরা। পারিভাষিক অর্থ হল মসজিদে একাকী আল্লাহ্কে আঁকড়ে ধরা। রমাযান মাসের সওয়াব পূর্ণ কর্মের মধ্যে ইতিকাফ অন্যতম। আল্লাহ্ বলেন, ''(ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে অঙ্গীকারবদ্ধ করলাম যে) তোমরা উভয়ে আমার (কাবা) গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ'' (২/১২৫)। আল্লাহ্ আরো বলেন, ''আর মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রী গমন করো না'' (২/১৮৭)। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইতিকাফ করেছেন, তার সাহাবাগণ ও তাঁর সাথে ইতিকাফ করেছেন (বুখারী ২০১৬, মুসলিম ১১৬৭)।

(চ) শবে কদরের খোঁজ ঃ কদরের রাত বা মহিমান্বিত রজনীতে আল্লাহ্ এক বছরের জন্য সৃষ্টির রুযি, মৃত্যু ও ঘটনাঘটনের লিপিবদ্ধ করেন। রমাযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলিতে শবে কদর অনুসন্ধান করতে হবে। এই রাতের বিশাল মর্যাদা ও মাহাত্ম্য রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবে কদরে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান শবে কদর কী? শবে কদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'' (৯৭/১-৩)। এই রাত অতি বরকতময়, কল্যাণময়, মঙ্গলময়। আল্লাহ্ বলেন, ''এই রাত সেই বরকতময়-রাত, যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'' (৪৪/৪)। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও নেকী লাভের আশায় শবে কদরের রাত্রিতে কিয়াম করে (স্বলাত পড়ে)। সে ব্যক্তির পূর্বেকার (সাগীরা) গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়'' (বুখারী ৩৫, মুসলিম ৭৬০)। বলা বাহুল্য এ রাত ইবাদাতের রাত; ধুম ধাম করে পান ভোজন, আমোদ, খুশীর রাত নয়। আসলে কল্যাণের রাত।

বেরোযদারের পরিণতি ঃ রমাযানের মাসে যারা মোটেই সওম রাখে না, চায়ের দোকানে দিবালোকে সবার সামনে চা খায় আর বলে আল্লাহ্কে ভয় করি না। তাদের জন্য তাদের পায়ের গোঁড়ালীর উপরে ছিদ্র করে সেখানে সুতো ভরে উল্টো করে টাঙ্গিয়ে রাখবে। তাদের চোয়াল ফেড়ে দেওয়া হবে, তাতে রক্ত ঝরবে। এ সম্বন্ধে উসামা বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন আমি শুনেছি— নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অতএব আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং পাহাড়ের মাঝখানে উপস্থিত হলে খুব জোর চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলাম, জিজ্ঞেস করলাম এ কীসের শব্দ কানে এল। তারা (ফেরেস্তারা) বলল, এ জাহান্নামবাসীদের চিৎকার। তারপর আমাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দেখলাম কিছু লোককে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের চোয়াল ফেড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে রক্ত ঝরছে। জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তারা বলল, এরা বেরোযাদার, এরা রমাযান মাসে দিনে খাওয়া দাওয়া করত'' (ইবনে খোযাইমা, ইবনে হিব্বান ৭৪৯১, হাকেম, সহীহ্ তারগীব ৯৯১)। বেরোযদার নরনারীরা জীবনে কত রমাযান পেল অথচ তাদের পাপরাশী মোচন করার ব্যবস্থা করতে পারল না। হায়রে হতভাগা মুসলিম! এ সম্বন্ধে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমাযান মাস পেল অথচ তার জীবনের পাপসমূহ ক্ষমার ব্যবস্থা হল না'' (আহমাদ ৭৪৫১, খুযাইমা ১৮৮৮, তিরমিযী ৩৫৪৫)। নাবী বলেন, ''(রমাযান মাসের) প্রত্যেক রাতে ও দিনে প্রত্যেক মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়'' (সহীহ্ তারগীব, আলবানী বায্যার)। রমাযান মাস হল কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াতের মাস। প্রশংসার অধিকারী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্র তরফ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস। এ মাস নেকী অর্জনের মাস। আল্লাহ্র নিকট বিনীত প্রার্থনা তিনি প্রতিটি মুসলিমকে সওম রাখার তাওফীক দান করুন— আমীন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''রমাযান মাস, যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সওম রাখে'' (২/১৮৫)।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : ইসলামের জন্য প্রথম রক্ত প্রবাহিত করার ঘটনা কোন্‌টি এবং এই ঘটনার প্রেক্ষাপট কী?

উ:— সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস কর্তৃক উটের শুকনো চোয়ালের হাড্ডি দিয়ে মেরে মুশরিকদের রক্তাক্ত করা। মুসলিমগণ পাহাড়ের পাদদেশে ও বিভিন্ন গোপন স্থানে মিলিত হয়ে জামাআতের সাথে স্বলাত আদায় করতেন ও দ্বীনের তালীম নিতেন। একদিন কতিপয় মুশরিক এটা দেখে ফেলে এবং মুসলিমদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস উটের শুকনো চোয়ালে হাড্ডি দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করেন। ফলে তারা পালিয়ে যায় (ইবনু হিশাম ১/২৬২-৬৩, আল্ বিদ্‌য়াহ্ ৩/৩৭)।

২। প্রশ্ন ঃ ইসলামের প্রথম রক্ত প্রবাহিত করার ঘটনাটি কোন্ নবাবী বর্ষে ঘটেছিল?

উঃ— চতুর্থ নবাবী বর্ষে ঘটেছিল।

৩। প্রশ্ন ঃ কোন্ নবাবী বর্ষে কার বাড়িটিকে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন?

উঃ— ৫ম নবাবী বর্ষে আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম আল মাখযূমীর বাড়িকে।

৪। প্রশ্ন ঃ আরক্বাম বিন আবুল আরক্বামের বাড়িটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ— বাড়িটি ছিল সাফা পাহাড়ের উপর, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে (আল্ বিদায়াহ্ ৫/৩৪১)।

৫। প্রশ্ন ঃ মযলুম মুসলিমদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী নির্দেশ দান করেন?

উঃ— হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দান করেন।

৬। প্রশ্ন ঃ হাবশার রাজার নাম কী, তিনি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

উঃ— রাজার নাম আসহামা নাজাশী। তিনি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

৭। হাবশায় হিজরতের কারণ কী?

উঃ— ন্যায় নিষ্ঠ রাজা হিসাবে নাজাশীর সুনাম ছিল। তাঁর রাজ্যে সমস্ত মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করত এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে দেওয়া হত।

৮। প্রশ্ন ঃ কোন নবাবী বর্ষের কোন মাসে কত জন পুরুষ ও নারী হাবশায় হিজরত করেন?

উঃ— ৫ম নবাবী বর্ষের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীর প্রথম দলটি হাবশায় হিজরত করেন।

৯। প্রশ্ন ঃ হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দলটির নেতা কে ছিলেন ?

উঃ— উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মহিলাদের মধ্যে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কন্যা রুকাইয়া।

১০। প্রশ্ন ঃ হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দলটি কীভাবে হাবশায় পৌঁছে ছিল?

উঃ— ভাগ্যক্রমে ঐ সময় লোহিত সাগরের বন্দর শো'আইবাহ্‌তে দুটো ব্যবসায়ীর জাহাজ নোঙর করা ছিল। ফলে তাঁরা খুব সহজে তাতে সওয়ার হয়ে হাবশায় পৌঁছে যান।

১১। প্রশ্ন ঃ কার নেতৃত্বে কত জন পুরুষ ও নারীর দ্বিতীয় দলটি হাবশায় হিজরত করে?

উঃ— জাফর বিন আবু ত্বালিবের নেতৃত্বে ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ বা ১৯ জন নারী।

১২। প্রশ্ন ঃ হাবশার বাদশাহ্ কর্তৃক সদাচরণের খবর শুনে কুরাইশ নেতারা কী করেছিল?

উঃ— মুসলিমদের উপর যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং কেউ যাতে হাবশায় যেতে না পারে সেদিকে কড়া নযর রাখতে লাগল। কারণ এর ফলে তাদের দুটি ক্ষতি ছিল। (ক) বিদেশের মাটিতে তাদের যুলুমের খবর পৌঁছে গেলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে, (খ) সেখানে মুসলিমরা সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে।

১৩। প্রশ্ন ঃ হাবশার মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশ নেতারা কী করেছিলেন?

উঃ— কুরাইশ নেতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পূর্ণ কূটনীতিবিদ্ আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু রাবীয়াহ্‌কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

পরবর্তী অংশ ৯৪ পাতায়

সিয়াম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

জবাব ঃ শায়খ সলিহ আল উসাইমীন হাফিযাহুল্লাহ্

১। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে দিনের বেলায় কোনো রোযাদার আতর জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে কি?

উত্তর ঃ রমাযান মাসে দিনের বেলায় আতর ব্যবহার ও সুগন্ধি নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই ; কিন্তু ধুপধূনা ও আগরবাতি ব্যবহরা করা যাবে না; কেননা এতে অস্তিত্বশীল প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। আর এ ধোঁয়া-ই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল।

২। প্রশ্ন ঃ কোনো রোযাদার যদি রমাযান মাসে (দিনের বেলায়) রোযা অবস্থায় হারাম তথা নিষিদ্ধ বাক্যালাপ করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ আমরা যদি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করি তাহলে সিয়াম বা রোযা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত কী তা জানতে পারি। আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান ফরয করা হল যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার'' (সূরা বাক্বারা ১৮৩ নং আয়াত)।

এখানে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, সিয়াম ওয়াজিব করার হিকমত হচ্ছে, তাকওয়া হাসিল ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। আর তাকওয়া হচ্ছে, যাবতীয় হারাম বিষয় বর্জন করা। সাধারণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যাবতীয় নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধাবলী বর্জন করাকে তাকওয়া বলে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কর্ম এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বর্জন করল না তার খাদ্য ও পানীয় বর্জন করার আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই'' এটাই যাবতীয় হারাম কথা ও কর্ম হতে বেঁচে থাকার প্রতি রোযাদারকে হুঁশিয়ার করে। অতএব মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, নিজেদের মধ্যে চুগলখোরী করবে না, হারাম পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং সর্বপ্রকার হারাম হতে দূরে থাকবে। যদি কোনো মানুষ পূর্ণ রমাযান মাসে এগুলি পালন করে চলে তাহলে রমাযান পরবর্তী সময়েও তার আত্মাকে কন্ট্রোল করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে ইন্‌শা-আল্লাহ্। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, অধিকাংশ মানুষই রোযার দিন ও অন্যদিনের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করে না বরং সাধারণ আদত তথা অভ্যাস অনুযায়ী মিথ্যাচর্চা, ধোকাবাজী, প্রতারণা ইত্যাদি হারামে লিপ্ত হয়ে যায়। রোযার মর্যাদা রক্ষা করা তার উপর অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ছিল সে বিষয়ে মোটেই খেয়াল করে না। হ্যাঁ, এসব কর্ম রোযা বাতিল করে না ঠিক কিন্তু নেকী কমে যায়। আবার এমনও হতে পারে যে, এ গুনাহের কারণে রোযার নেকী সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩। প্রশ্ন ঃ রমাযানের কাযা রোযা আদায় করার পূর্বে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা আদায় করা জায়েয হবে কি? রমাযানের কাযা আদায়ের নিয়তে ও সোমবারের নেকী লাভের আশায় শাওয়াল মাসের সোমবার দিন রোযা রাখা কি জায়েয?

উত্তর ঃ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রমাযানের রোযা পূর্ণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার সোওয়াব হাসিল করতে পারবে না। অতএব যদি কারো রমাযান মাসের রোযা কাযা হয়ে থাকে তাহলে সেই কাযা রোযা আগে আদায় করবে তারপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা করবে; কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন , ''যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা রাখল অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করল....'' অতএব এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যার রমাযানের রোযা কাযা থাকবে সে প্রথমে রমাযানের কাযা রোযা সম্পন্ন করবে অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা আদায় করবে। তবে শাওয়ালের এই ছয়টি রোযা আদায় করা কালীন যদি সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবার পড়ে যায় তাহলে এ ছয়টি রোযার সোওয়াবের সাথে সাথে সোমবার ও বৃহস্পতিবারেরও নেকী হাসিল করবে। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''প্রতিটি আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিটি মানুষের জন্য তা-ই হবে যা সে নিয়ত করবে।''

৪। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় চিকিৎসার জন্য স্যালাইন গ্রহণ করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ চিকিৎসার জন্য যে স্যালাইন ব্যবহার করা হয় তা দুই ধরণের যথা ঃ (ক) খাদ্য জাতীয় স্যলাইন, যা ব্যবহার করলে খাদ্য ও পানের চাহিদা পূরন করে। এরূপ স্যালাইন ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, যাতে আসল রূপের সাথে কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য থাকবে তাতে আসল রূপেরই বিধান বাস্তবায়িত হবে।

(খ) খাদ্য বিহীন স্যালাইন ঃ এতে খাদ্য ও পানের চাহিদা মেটায় না। এরূপ স্যালাইন ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবে না। কেননা এতে শাব্দিক ও পারিভাষিক কোনো প্রকার মূলনীতি পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা খাদ্য ও পানীয় নয় এবং খাদ্য ও পানীয়'র বিকল্পও নয়। আর রোযা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত

রোযা ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত রোযা সহীহ হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ গলায় গড় গড়া করার ঔষধ ব্যবহার করলে সিয়াম বাতিল হয়ে যায় কি?

উত্তর ঃ ভিতরে প্রবেশ না করলে রোযা বাতিল হবে না, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত গলায় গড়াগড়া করার ঔষধ ব্যবহার না করাই উত্তম। যদি (পেটের) কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে না পৌঁছে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৬। প্রশ্ন ঃ রমাযান মাসে রোযাবস্থায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তার সিয়াম সহীহ্ হবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে, কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভূক্ত। মিথ্যা সাক্ষ্য হচ্ছে, কোনো বিষয়ে না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া অথবা জেনেও তার বিপরিত সাক্ষ্য দেওয়া। এ কারণে রোযা বাতিল হবে না তবে নেকি কমে যাবে।

৭। প্রশ্ন ঃ সিয়ামের (রোযার) সামাজিক কোনো উপকারিতা বা প্রভাব আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সিয়ামের সামাজিক উপকারিতা অবশ্যই রয়েছে। যেমন মানুষ এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা একই উম্মাত, তারা একই সময়ে খায় এবং একই সময়ে রোযা পালন করে। আর ধনীরা আল্লাহ্‌র নেয়া'মতের কথা অনুভব করতে পারে, ফকিরদের প্রতি দয়াপরবশ হয় এবং শয়তানও মানুষকে খুব কম বিভ্রান্ত করতে পারে। আর সিয়াম দ্বারা আল্লাহ্ ভীতি মজবুত হয় ও সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৮। প্রশ্ন ঃ আমার পিতা অসুস্থতার কারণে ২১শে রমাযান রোযা ভেঙ্গে দেন এবং মেডিক্যাল চিকিৎসাধীন থাকা কালে নয়-ই শাওয়াল মারা যান। তাঁর সিয়ামের বিধান কী হবে?

উত্তর ঃ রোগ যদি এমন হয় যে, তা দূর হওয়ার আশা করা যায় না তাহলে প্রতি দিনের রোযার বদলে একজন মিসকিনকে খাবার দিবে। আর যদি এমন রোগ হয় যা আরোগ্য লাভের আশা করা যায় কিন্তু রমাযান শেষ হওয়ার পরই মারা যায় যা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট হয়েছে, এরূপ হলে তার উপর কোনই বিধান অপির্ত হবে না, কেননা আসলে এ রোযার কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব কিন্তু সে তার সুযোগ পায়নি (সুস্থ হওয়ার পূর্বেই মারা গেছে, কাজেই তার কোনো কাফ্‌ফারা লাগবে না)।

৯। প্রশ্ন ঃ যে মুসলমান রোযা করে কিন্তু নামায আদায় করে না তাকে কিছু কিছু উলামা খুব দোষারোপ করেন ও ধিক্কার দিয়ে থাকেন। অতএব সিয়ামের সাথে নামাযের কী সম্পর্ক রয়েছে? আর আমি রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আশায় সিয়াম পালন করি। তাছাড়া দুই রমাযানের মধ্যবর্তী সময়ের কৃত গোনাহের জন্য পরবর্তী রমাযান কাফ্‌ফারা স্বরূপ। অতএব এ বিষয়ে আপনার নিকট বিস্তারিত জানতে চাই? আল্লাহ্ আপনাকে তাওফীক দান করুন।

উত্তর ঃ আপনি সিয়াম পালন করেন অথচ সলাত আদায় করেন না, এজন্য যারা আপনাকে দোষারোপ করেন তাঁরা সঠিক কারণেই আপনাকে দোষারোপ করে থাকেন। কেননা এ সলাতই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ এবং এ সলাত ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকে না। আর এ সলাত ত্যাগকারী কাফের ও মিল্লাতে ইসলাম হতে বাহিরে অবস্থানকারী। আল্লাহ্ কোনো কাফেরের সিয়াম, সাদ্‌কা, হজ্জ ইত্যাদি এছাড়াও অন্যান্য সৎ আমল কবুল করেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''আর তাদের দান খায়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তাঁরা সলাতে শিথিলতার সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ দান করে'' (সূরা তাওবাহ্ ৫৪)। আপনি রোযা রাখেন অথচ নামায আদায় করেন না। অতএব আমরা এর ভিত্তিতে আপনাকে বলতে পারি যে, আপনার সিয়াম বাতিল, সহীহ্ বা শুদ্ধ নয়। এ সিয়াম আল্লাহ্‌র নিকট আপনার কোনোই উপকারে আসবে না এবং এ সিয়াম দ্বারা আপনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যও লাভ করতে পারবেন না। আর এক রমাযান বিগত রমাযানের (দুই রমাযানের) মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের কাফ্‌ফারা বলে আপনি যে ধারণা করেন, সে সম্পর্কে আমরা অপনাকে বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি আপনি ভালভাবে অবগত নন। কেননা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আহ হতে অপর জুম'আহ্ এবং এক রমাযান থেকে অপর রমাযান মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ যদি সে কাবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে''। এক রমাযান থেকে অপর রমাযানের মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের মাফ হওয়ার জন্য নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি শর্তারোপ করেন, তা হচ্ছে যাবতীয় কাবীরা গোনাহ হতে নিজেকে হেফাযত করা। আর আপনি এমন ব্যক্তি যে, সিয়াম পালন করেন কিন্তু সলাত আদায় করেন না, ফলে আপনি নিজেই কাবীরা গোনাহ্ হতে বাঁচতে পারেননি। সলাত তরকের চাইতে অধিক বড় কাবীরা গোনাহ আর কী হতে পারে? বরং সলাত ত্যাগ করা হচ্ছে কুফরী। সুতরাং নামায তরকের মাধ্যমে আপনি যে কুফরী করছেন তাতে আপনার সিয়াম কীভাবে আপনার

গোনাহ্ মাফ করবে? সলাত তরকের মত কুফরী করার কারণে আপনার সিয়াম কবুল করা হবে না। অতএব খালেস তাওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা, আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত সলাত আদায় করা অতঃপর সিয়াম পালন করা আপনার উপর ওয়াজিব। এজন্যই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মা'আয বিন জাবাল (রাযি আল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন, তুমি তাদেরকে প্রথমে '' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল'' এ সাক্ষ্যের দাওয়াত দিবে। যদি তারা একথা মেনে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের উপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন একথা অবহিত করবে। যেহেতু দুই সাক্ষ্যের পর সলাত অতঃপর যাকাতের বিধান দিয়ে শুরু করলেন। সুতরাং সলাতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

১০। প্রশ্ন ঃ আমি শুনেছি যে, মেহেদি ব্যবহার করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব সিয়াম ও সলাত অবস্থায় মাথায় (চুলে) মেহেদি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ একথার কোনো সহীহ্ ভিত্তি নেই, কেননা চোখের সুরমা, চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহারের ন্যায় সিয়াম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকী রোযাদারের উপর কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়াও পড়বে না। কেননা এসব কিছুই রোযাদারের কোনো ক্ষতি করে না এবং রোযাও ভঙ্গ করে না। আর মেহেদি ব্যবহার অবস্থায় নামায পড়ার প্রশ্নটি কেমন প্রশ্ন তা বুঝতে পারছি না, কারণ নামায চলা অবস্থায় মেহেদী লাগানোর প্রশ্নই উঠে না, নামায অবস্থায় তা সম্ভব নয়। হয়তবা তিনি জানতে চাচ্ছেন যে, কোনো মহিলা যদি মেহেদি ব্যবহার করে তাহলে তার অযু সহীহ্ হবে কিনা? মেহেদি অযু শুদ্ধ হওয়ার প্রতিরোধক নয়। কেননা মেহেদির এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নাই যাতে অযুর স্থানে পানি পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করবে। এটা কেবল একটি রং মাত্র। আর যা অযু নষ্টের কারণ হয় তাতে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ থাকে ফলে পানি পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি করে, তা দূর করা অবশ্য জরুরী যেন অযু সহীহ্ হয়।

জবাব ঃ শায়খ আব্দুল্লাহ্ আল জিবরীন হাফিযাহুল্লাহ্ তাআলা

১। প্রশ্ন ঃ এক মসজিদের ইমাম তারাবীর নামাযে প্রতি রাকআতে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা বা প্রায় পনেরো আয়াত পাঠ করেন ফলে মুসল্লিদের অনেকেই বলেন, ক্বিরাত অনেক লম্বা হচ্ছে আবার কেউ এর বিপরীত বলেন। অতএব তারাবীর নামাযে কী পরিমাণ তিলাওয়াত করা সুন্নাত ? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তারাবীহ্ নামাযের কোনো সীমা বা সংখ্যা বর্ণনা করেছেন কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমাযান মাসে ও অন্য মাসের রাতে এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। কিন্তু নামাযের রুকন আরকান সহ ক্বিরাত দীর্ঘ করতেন। এমনকী তিনি একদা এক রাকাআতেই ধীর-স্থীরভাবে তারতীল সহ পাঁচ পারা তিলাওয়াত করেন। আরও প্রমাণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মধ্য রাতে কিংবা তার একটু আগে কিংবা একটু পরে রাতের সলাত শুরু করে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আদায় করতেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী মাত্র তের রাকাআত নামায পড়তেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ক্বিরাত সহ রুকন আরকান ধীর স্থিরভাবে লম্বা করে পড়তেন।

অনুরূপভাবে উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) যখন সাহাবাদেরকে তারাবীহ্র সলাতের জন্য একত্র করলেন তখন তাঁরা এক রাকাআতেই সূরা বাক্বারার ত্রিশ আয়াত যা প্রায় চার অথবা পাঁচ পৃষ্ঠা পরিমাণ তিলাওয়াত করেন। অতএব তাঁরা যদি বারো রাকাআতে সূরা বাক্বারা পূর্ণ তিলাওয়াত করতেন তাহলে তা তাঁরা হালকা মনে করতেন। তারাবীহ্র নামাযে এরূপ করাই হচ্ছে সুন্নাত। আর তারাবীহ্ নামাযের ক্বিরাআতের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়বে যাতে এতমিনান ও ধীর স্থিরতা হাসিল হয়। যেন এক ঘণ্টা বা অনুরূপ সময়ের কম না হয়। এর পরও যারা এটাকে দীর্ঘায়িত বলে মনে করবে তারা সুন্নাতের খেলাফ করবে। সুতরাং এরূপ কথার প্রতি কোনোই গুরুত্ব দেওয়া যাবে না।

২। প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্র নামায যুহরের ন্যায় দুই রাকআত পরে তাশাহ্হুদের জন্য বসুক অথবা না বসুক এক সালামে চার রাকাআত করে পড়ার বিধান কী?

উত্তর ঃ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''রাতের নামায দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে...'' এতে প্রমাণিত হয় প্রতি দুই রাকাআতের পর সালাম ফেরানো। তারাবীহ্র নামাযে সাহাবায়ে কিরাম ও আয়েম্মায়ে এযাম হতে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কিয়াম ও রুকু সাজদা অনেক দীর্ঘ করতেন এবং প্রতি চার রাকাআত অন্তর একটু বিশ্রাম নিতেন। আর এজন্যই এ নামাযকে তারাবীহ্ তথা বিশ্রামের নামায

নামকরণ করা হয়েছে। তবে বিতর নামায তিন রাকআত অথবা পাঁচ রাকাআত কিংবা সাত রাকাআত একই সালামে পড়া জায়েয, সব শেষ রাকাআতে সালাম ফেরাবে। আয়েশা (রাযি আল্লাহু আনহা) কর্তৃক সহীহ্ হাদীসে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

৩। প্রশ্ন ঃ আমি প্রায় সতের বছরের এক যুবতী, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি গত দুই বছর পূর্বে রমাযান মাসের যে রোযা ভঙ্গ করেছিলাম তার কাযা এখনও আদায় করিনি। অতএব এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ ধারাবাহিকভাবে না হলেও পৃথক পৃথকভাবে অতি শীঘ্রই ঐ দিনগুলির রোযার কাযা আদায় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এক বছরেরও অধিক কাল বিলম্বের জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে। আর কাফ্ফারা হচ্ছে, প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করা। জমহুর উলামা অনুরূপই বলেন।

৪। প্রশ্ন ঃ আমি অল্প বয়সে বিবাহ করি, ফলে রোযার মাসে রোযার সংকল্প করার পর ফজর আযানের পরও আমি স্ত্রী সহবাস করে বসি, এরূপ ঘটনা দুদিন ঘটেছে অবশ্য প্রতিদিন একবার করে। জ্ঞাতব্য যে, এব্যাপারে আমার স্ত্রীও একমত ছিল। অতএব আমার ওপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব এবং আমার স্ত্রীর ওপর কি কাফ্ফারা ওয়াজিব তা আপনার নিকট জানতে চাই। উল্লেখ্য যে, এভাবে পাঁচ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে অসংখ্য উত্তম জাযা দান করুন, অস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর ঃ উল্লেখিত দু'দিনের রোযার কাযা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। সেই সাথে রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কারণে আপনার ওপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব। এর কাফ্ফারা হচ্ছে, জেহারের কাফ্ফারার অনুরূপ, আর তা হচ্ছে, একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে, তা যদি না পায় তাহলে ধারাবাহিকভাবে দুইমাস রোযা রাখবে, এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করবে। অনুরূপভাবে আপনার স্ত্রীর উপরও রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব। এজন্য যে, সে এটা হারাম জেনেও তাতে সম্মতি দিয়েছে।

জবাব ঃ সরল পথ পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ যাকাতুল ফিতরে অর্ধ সা' গমের হাদীস আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু ওয়াবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী উক্ত হাদীসকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন (সহীহুল জামে ২৪১, সিলসিলা সহীহাহ্ ১১৭৭, মিরআত ৩/৯৭-৯৮)। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন। — কারীমা, গুমানী

উত্তর ঃ ওয়াবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরীর উক্তিই সঠিক অর্থাৎ যাকাতুল ফিতরে অর্ধ সা' গমের হাদীস যঈফ (মিরআত ৩/১০৪)। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে মুসনাদ ধরে সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হাদীসটি সহীহ্ হবে না। কারণ উক্ত সনদের রাবী ইবনু জুরাইয মুদাল্লিস। আর উক্ত হাদীস ইবনু জুরাইযের আন্আন দিয়ে বর্ণিত। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীও তাকে মুদাল্লিস বলেছেন। (সিলসিলা সহীহাহ্ ১/৪৫৪)

২। প্রশ্ন ঃ একজন হাফিযে কুরআনের বয়স ১৩ বছর ২ মাস। তার পিছনে তারাবীর স্বলাত হবে কি? — সিরাজুল ইসলাম, নিউবঙ্গাই গাঁও, আসাম

উত্তর ঃ— হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/২৮৫, নাসাঈ ৭৮৯, আবূ দাউদ ৫৮৫, সহীহ্ ইবনু খুযাইমা ১৫১২)। আমর বিন সালিমা (রাযি আল্লাহু আনহু) প্রায় ৭ বছর বয়সে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে ফরয স্বলাতে ইমামতি করতেন (ফাৎহুল বারী ২/১৮১)। উল্লেখ্য মুকাল্লিদরা বলেছেন, ''এ ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে।'' তাদের এ দাবী দলীলবিহীন হওয়ার সাথে সাথে ডাহা মিথ্যা। কেননা আমর বিন সালিমা (রাযি আল্লাহু আনহু) এর অত্র ইমামতির ঘটনা মক্কা বিজয়ের পরের (বুখারী ৪৩০২)।

এস. এফ. প্রিন্টার্স

প্রোঃ - মুহাঃ জহিরউদ্দিন আহমেদ

এখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে আরবী, বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ ভাষায় কম্পোজ ও যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়।

বড়ুয়া মার্কেট কমপ্লেক্স (মিল্লাত বুক হাউস)

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

Email : sfprintersbld@gmail.com

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪

বিঃ দ্রঃ — মোবাইলে ফোন করে আসুন।

সংগঠন সংবাদ

বিগত ১৮.০৩.২০১৮ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব সূরাহ্ তাওবাহর ১১৯-১২১ নং আয়াত তেলাঅত করেন এবং উক্ত আয়াতগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাদের বিশ্বাসীগণ বলে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। মদীনাবাসীদের ও তার পার্শ্ববর্তীদের এটা সঙ্গত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রসূলের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তারা পেছনে থেকে যাবে এবং তারা নিজেদের প্রাণকে বেশি প্রাধান্য দিবে আল্লাহ্‌র রসূলের প্রাণের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে যে পিপাসা, ক্লান্ত ও ক্ষুধা পায়। আর অবিশ্বাসীদের ক্রোধ সৃষ্টি করে এমন স্থানে তারা যে পদক্ষেপ করে এবং শত্রুদের নিকট হতে তারা যা লাভ করে। তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ করা হয়। মূলতঃ তাবুক যুদ্ধে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ জরুরী ছিল। কিন্তু যারা সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের তিরস্কার ও ধমক স্বরূপ আল্লাহ্ বলেছেন তাদের পিছিয়ে থাকা উচিৎ হয়নি। কেননা যারা যুদ্ধে ছোটো বড়ো অর্থাৎ অল্প ও বেশি যাই দান করে তা তাদের আমলের খাতায় উত্তম বিনিময় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে যারা রাজ্য সম্মেলনে অল্প হোক বা বেশি যা তারা দান করেছে এবং রাজ্য সম্মেলনকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই যোগ্য প্রতিদান প্রদান করবেন সন্দেহাতীত ভাবে। কেননা রাজ্য সম্মেলন কাউকে তুচ্ছ প্রমাণ করতে বা কারও প্রাধান্য বা শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়নি বরং সামগ্রিকভাবে সততার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসুন আল্লাহ্‌র কাছে আমরা দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের কাছ থেকে এরকম আরও ভালো কাজ করিয়ে নেন।

অদ্য সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যথা —

১। জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও জেলার সমস্ত ব্লক কমিটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

২। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি ব্লককে তাদের সাধ্যমতো ১০ হাজার অথবা পাঁচ হাজার করে টাকা জেলা অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়।

৩। রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাদের চরম আত্মত্যাগের জন্য জমঈয়ত কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৮৯ পাতার পর —

১৪। প্রশ্ন ঃ উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন ?

উঃ— তারা মূল্যবান উপঢৌকনাদি নিয়ে হাবশায় যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে প্রথমে খ্রিষ্টানদের নেতৃস্থানীয় ধর্ম নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। তাদের ক্ষুরধার যুক্তি এবং মূল্যবান উপঢৌকনাদিতে ভুলে পাদ্রী নেতারা একমত হলেন। পরের দিন নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুহাজীরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন পেশ করেছিলেন।

১৫। প্রশ্ন ঃ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহ্ নাজাশী কী করেছিলেন এবং তার ফলাফল কী হয়েছিল ?

উঃ— বাদশাহ নাজাশী মুসলিম মুহাজিরদের সভায় ডেকে তাঁদের হিজরতের কারণ জানতে চাইলেন। তখন জাফর বিন আবু ত্বালিব তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য ও সূরা মারিয়াম তেলাওয়াতের মাধ্যমে বাদশাহ নাজাশীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। তার ফলে বাদশাহ্ নাজাশী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকলেন। সাথে উপস্থিত পাদ্রীগণও কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের চোখের জলে তাদের হাতে ধরা ধর্মগ্রন্থগুলি ভিজে গেল। অতঃপর নাজাশী বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় এই কালাম এবং ঈসার নিকট যা নাযিল হয়েছিল দুটি একই আলোর উৎস থেকে নির্গত।' একথা বলেই তিনি কুরাইশের দিকে দ্রুত ফিরে বললেন, 'তোমরা চলে যাও আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনোই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিবো না।'

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই মে -১৫ই জুন)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ মে	৩:২৯	৪:৫৩	১১:৩৪	২:৫৮	৬:১৪	৭:৩৮
১৭	৩:২৯	৪:৫৩	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৪	৭:৩৯
১৮	৩:২৮	৪:৫২	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৫	৭:৩৯
১৯	৩:২৮	৪:৫২	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৫	৭:৪০
২০	৩:২৭	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৬	৭:৪১
২১	৩:২৭	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৬	৭:৪২
২২	৩:২৬	৪:৫১	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৭	৭:৪২
২৩	৩:২৬	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৭	৭:৪৩
২৪	৩:২৫	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৮	৭:৪৪
২৫	৩:২৫	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৭	৬:১৮	৭:৪৪
২৬	৩:২৪	৪:৫০	১১:৩৪	২:৫৬	৬:১৯	৭:৪৫
২৭	৩:২৪	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:১৯	৭:৪৫
২৮	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২০	৭:৪৬
২৯	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২০	৭:৪৭
৩০	৩:২৩	৪:৪৯	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭:৪৭
৩১	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭৪৮
১লা জুন	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২১	৭:৪৮
২	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৫	২:৫৬	৬:২২	৭:৪৯
৩	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২২	৭:৫০
৪	৩:২২	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৩	৭:৫০
৫	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৩	৭:৫১
৬	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৪	৭:৫১
৭	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৬	২:৫৬	৬:২৪	৭:৫২
৮	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৪	৭:৫২
৯	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১০	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১১	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৫	৭:৫৩
১২	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৭	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৪
১৩	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৪
১৪	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৬	৭:৫৫
১৫	৩:২১	৪:৪৮	১১:৩৮	২:৫৭	৬:২৭	৭:৫৫

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১ও ১২তম সংখ্যা • রজব-শা'বান-রমাযান-১৪৩৯ • এপ্রিল-মে- ২০১৮
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ৩৫/- টাকা মাত্র
Printed by : S.F. Printers, Beldanga, 9434531957